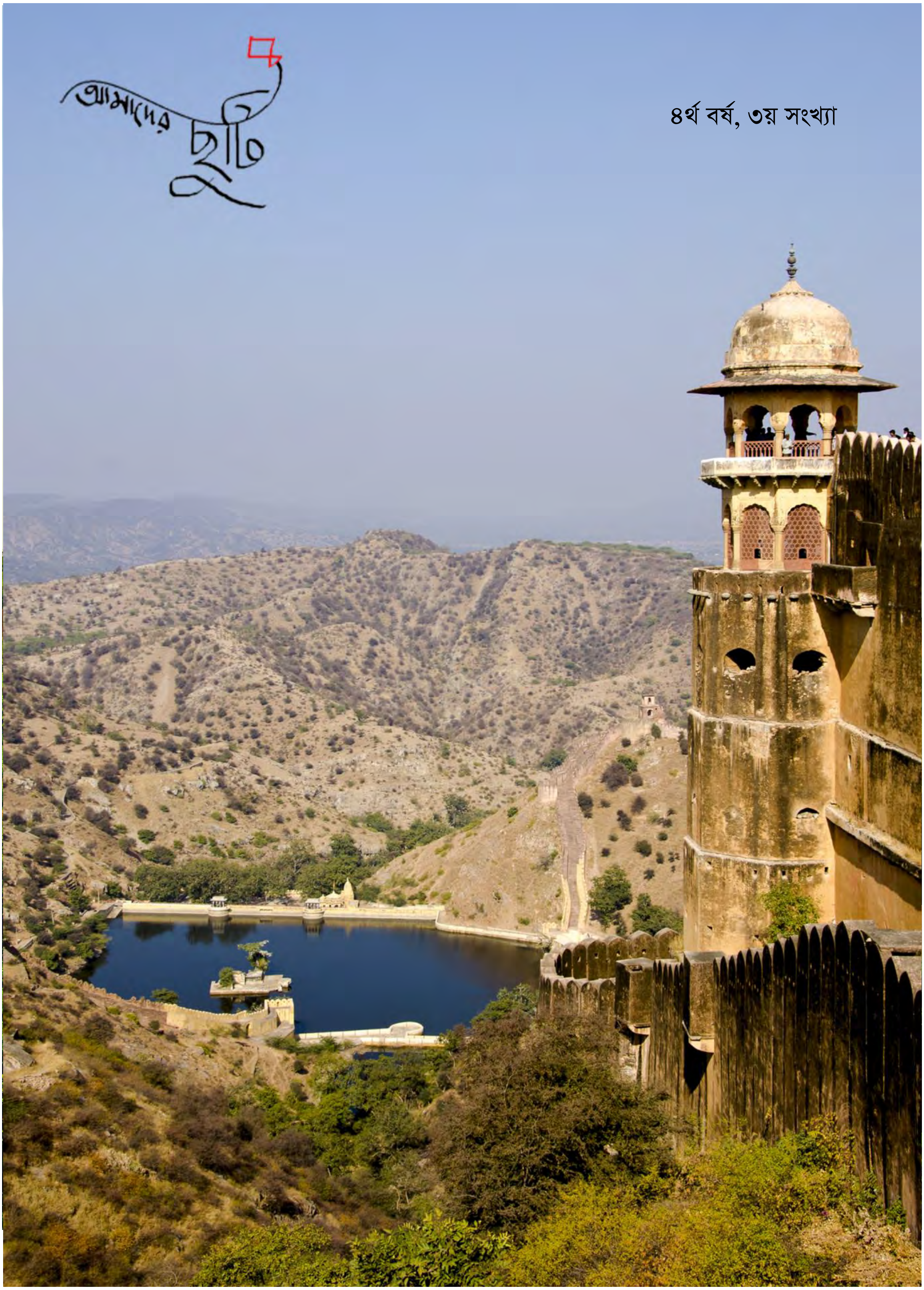

জয়গড় দুর্গ - জয়পুর, রাজস্থান
আলোকচিত্রী - রত্নদীপ দাশগুপ্ত

বেড়ানোর কথা আর ছবি নিয়ে বাংলা ই-ম্যাগাজিন

~ ৪র্থ বর্ষ ৩য় সংখ্যা -কার্তিক ১৪২১ ~

দিনের পর দিন সংবাদপত্রের পাতায় প্রকৃতির রোষের ভয়াল রূপ আর মানুষের অমানবিকতার ছবি দেখতে দেখতে আর খবর পড়তে পড়তে ভ্রমণ পত্রিকার সম্পাদকীয় লেখাটা এই পুজো-ঈদ-দীপাবলীর মরশুমেও ভীষণ কঠিন লাগছিল। কাকলি সেনগুপ্তের লেখাটা পাওয়ার পর মনে হল তা সম্ভব। তাঁর ভাষাতেই বলি, "ইতিহাস আমাদের দেখিয়েছে মানুষ মানুষকে কতটা আঘাত করতে পারে, মনুষ্যত্বের কতটা অবমাননা হতে পারে। সেটা সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে কী ভীষণ ক্ষতিকর! তবু মানুষ বারবার ভুল করে। নৃশংস আক্রমণের হাত থেকে স্কুল-হসপিটালও ছাড় পায়না। স্কুলে পড়তে গিয়ে বাচ্চারা আর বাড়ি ফিরে আসেনা। বোমার আঘাতে নিহত শিশুদের দেহে মর্গ উপচে পড়ে, দেহ রাখতে হয় আইসক্রীমের ফ্রিজারে। একজন মা হিসেবে নিজেকে তখন খুব অসহায় মনে হয়"। তবু শেষ পর্যন্ত আশার আলো দেখেছেন এবং দেখাতে চেয়েছেন কাকলি। ভ্রমণ কাহিনিটি অন্য মাত্রা পেয়েছে সেখানেই।

বন্যাবিধ্বস্ত কাশ্মীর ও সাইক্লোন-পরবর্তী অন্ধ্র-ওড়িশা উপকূলের পরিস্থিতি খুবই মর্মন্তুদ। কিন্তু বিষয়টা আরও দুঃখজনক হয়ে ওঠে যখন কাশ্মীর বলেই কিছু মানুষ সরবে অথবা নীরবে মনে করেন বেশ হয়েছে। দুর্যোগের রেশ যতদিন চলবে ততদিন সাহায্য আসবে, ত্রাণ আসবে, তারপর আমরা ধীরে ধীরে ভুলে যাব। আর ওদিকে প্রিয়জনকে হারানোর বেদনা কাটিয়ে উঠে নিজের ঘর-দোকান-আজীবনের সঞ্চয়, জলের নীচে হারিয়ে যাওয়া ফসলি জমি, পালিত পশু - বেঁচে থাকার উপাদানগুলির পুনর্নির্মাণে হয়তো এই জায়গাগুলির সাধারণ মানুষের অনেকের বাদবাকী জীবনটাই কেটে যাবে। বেড়াতে যেতে ভালবাসি তো আমরা সকলেই, তাহলে সেখানকার মানুষদের সহমর্মী কি আমরা হতে পারি না?

'ভ্রমণ'-এর অন্যতম উদ্দেশ্য 'দেখা'। আমি কী দেখছি আর কীভাবে দেখছি সেই অভিজ্ঞতার ওপরেই নির্ভর করবে আমার ভ্রমণ কাহিনির গড়ে ওঠা - তা কোন জায়গার প্রাকৃতিক দৃশ্য, ইতিহাসের নিদর্শন যেমন হতে পারে, তেমনি স্থানীয় মানুষজন, তাদের সুখ-দুঃখ, সেখানকার সমাজ পরিস্থিতি - এরকম যে কোন কিছুই হতে পারে। 'কোথায় যাবেন', 'কী দেখবেন', 'কোথায় থাকবেন', 'কী খাবেন', 'কী কিনবেন' -এর বাইরে বেরিয়ে আমরাই পারি 'অন্যরকম দেখা'-য় পৃথিবীকে দেখতে। যেভাবে দেখেছিলেন মার্কো পোলো, হিউয়েন সাঙ, ইবন বতুতা কিংবা স্বর্ণকুমারী, রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ এবং আরও অনেকেই। আজকের দিনের আমরা যাঁদের চোখে দেখি-জানি সেদিনের জগৎটাকে।

কে বলতে পারে এই মুহূর্তে কারও দেখার চোখে আজকের কলকাতা ইতিহাস হয়ে উঠছে না?

এবছর ঊনবিংশ শতকের তিন স্বনামধন্য বাঙালি মহিলা অবলা বসু, কৃষ্ণভাবিনী দাস এবং কামিনী রায়ের জন্মের সার্ধশতবর্ষ। এঁদের মধ্যে 'ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা' খ্যাত কৃষ্ণভাবিনী বাদে বাকী দুজনকে ভ্রমণ লেখিকা হিসেবে আমরা চিনি না। কামিনী রায় ভ্রমণ লেখিকা ননও। তাঁর একটি মাত্র ভ্রমণ কাহিনির খানিকটা পাওয়া যায় পুরোনো এক সাময়িকপত্রে। অবলা বসু অবশ্য স্বর্ণকুমারী দেবীর মতই দীর্ঘদিন ধরে পত্রপত্রিকায় ভ্রমণ কাহিনি লিখেছিলেন। কিন্তু তাঁর মূল লেখাগুলির অধিকাংশই আজ দুষ্প্রাপ্য। কৃষ্ণভাবিনীর বইটি একাধিকবার পুনঃপ্রকাশিত হলেও সাময়িকপত্রে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়ে গেছে অনেক টুকরো লেখাই যা তাঁর বিলেত ভ্রমণের অনুষঙ্গে লেখা হয়েছিল। এই সংখ্যায় তিন লেখিকার তিনটি দুষ্প্রাপ্য ভ্রমণ কাহিনি - 'আমাদের ছুটি'-র তরফে আজকের পাঠকের জন্য।

উৎসবের দিনগুলো ভালো কাটুক সব্বার... পাশাপাশি হোক কলরব-ও।

- দময়ন্তী দাশগুপ্ত

এই সংখ্যায় -

"...কাছে গিয়ে দেখা গেল, দূর থেকে যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই, দুধের পুরু সর অদ্ভুত কায়দায় দুটো কাঠির সাহায্যে তুলে নেওয়া হচ্ছে কড়াই থেকে, চারভাঁজ করে শালপাতার বাটির ওপর রেখে অল্প একটু চিনি ছড়িয়ে হাতে তুলে দিল দোকানি, আঃ! কী দারুণ খেতে।"

- আড্ডা দিলেন ফেসবুক গ্রুপের বন্ধুরা

"জাপান দেশটী প্রকৃতির এক রম্য কানন। ইহার প্রতি বৃক্ষলতা, প্রতি গিরিনির্ঝর, প্রতি গৃহ সৌন্দর্যময়। প্রকৃতিদেবী এই দেশের উপর তাঁহার ভাণ্ডারের সমুদয় সৌন্দর্য্য রাশি অজস্র ধারায় বর্ষণ করিয়াছেন..."

- 'জাপান ভ্রমণ' - অবলা বসুর কলমে

"বাহির হইতে দেখিতে বিলাতের রাজধানীটী বড় সুন্দর নয়। উহাতে আমাদের সহরের মত ধপধপে চুণকাম করা বড় বড় বাড়ী নাই, আর তাহাতে সবুজ খড়খড়ের বাহারও নাই। যেখানে যাও দেখিবে রাস্তার দুই পার্শ্বে কেবল এক রকম ধোঁয়াটে রঙের কাল কাল বাড়ী, সার বেঁধে দাঁড়াইয়া আছে।"

- 'বিলাতের গল্প' - কৃষ্ণভাবিনী দাসের লেখনীতে

"এবার রেলের দুই পার্শ্বস্থ বালুকারাশি জ্যোৎস্নালোকে এমন সুন্দর দেখাইতেছিল যে আমরা দেখিয়া আর চক্ষু ফিরাইতে পারি নাই - ; ঠিক বোধ হইতেছিল যেন আমরা শুভ্রফেণ অচঞ্চল জলরাশির মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতেছি।"

- 'দার্জ্জিলিং ভ্রমণ' - কুমারী কামিনী সেনের কথায়

~ চরৈবতি ~

জীবনে প্রথমবার ট্রেকিং করতে গিয়ে ঘুরেছিলেন হেমকুণ্ড, ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স, বদ্রীনারায়ণ, মানা, বসুধারা, ত্রিযুগী নারায়ণ, কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী-গোমুখ ও যমুনোত্রী। ফিরে এসে ডায়েরির পাতায় লিখে রেখেছিলেন ভ্রমণের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার কথা।

- সুবীর কুমার রায়ের ভ্রমণ ধারাবাহিক 'হিমালয়ের ডায়েরি'-র এবারে দ্বিতীয় পর্ব - "ফুলের দেশে কিছুক্ষণ"

~ আরশিনগর ~

আমার মায়ের বাপের বাড়ির দেশে - অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়

~ সব পেয়েছির দেশ ~

রঙবাহারি রাজস্থান - দেবাশিস বসু

মহাপ্রস্থানের পথে - সুজয় গোস্বামী

সমুদ্রকন্যা লাক্ষাদ্বীপ - শ্রাবণী দাশগুপ্ত

স্বপ্নের লাদাখ - অভিষেক দাস

~ ভুবনডাঙা ~

অন্য ইতালি - কাকলি সেনগুপ্ত

কানাডার তুষাররাজ্যে কয়েকদিন - অয়ন চৌধুরী

~ শেষ পাতা ~

আশ্চর্য সরোবর মূলকারখা - প্রীতম সাহা

হলং-এ এক রাত্রি - জয়ন্ত লাহা

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com

© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu

Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

-->

কথোপকথন

['আমাদের ছুটি' আন্তর্জাল ভ্রমণ পত্রিকার ফেসবুক গ্রুপে সদস্য সংখ্যা ২০ হাজার ছাড়িয়েছে অনেকদিনই। গ্রুপে নিয়মিত বেড়ানোর ছবি পোস্ট করার পাশাপাশি মাঝেমধ্যে নানা বিষয়ে আড্ডাও জমে ওঠে সদস্যদের মধ্যে। পুজোর ছুটির ঠিক আগে আগে চোখে পড়ল সুমিত নাথের এই পোস্টটি। বেড়াতে আর খেতে আমরা কে না ভালোবাসি! বেড়াতে যাওয়ার আগে নতুন জায়গায় কী কী দেখা যাবে-র পাশাপাশি কী কী নতুন খাবার পাওয়া যাবে সেটাও খোঁজ নিয়ে নিই আগেভাগেই। গ্রুপের এই মজার আড্ডাটা পড়তে পড়তে মনে হল ফেসবুকে থাকলেতো দুদিনবাদে হারিয়েই যাবে পোস্টটা, বরং পত্রিকার পাতায় জমিয়ে পড়া যাবে যখন ইচ্ছে আর বেড়াতে গিয়েও ভুলে গেলে একবার অথবা বারবারই চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাবে। পড়তে পড়তে আমারওতো মনে পড়ে যায় কত কথা, থুড়ি জিভে জল আনা কত স্বাদ –পোর্টব্লেয়ারের তিল্লাই বেকারির হলুদ রঙের নরম স্পঞ্জ কেক আর নারকেল ও ক্রিমে ভরা বানরুটি, হ্যাভলক দ্বীপের ওয়াইল্ড অর্কিড রেস্তোরাঁয় বিশাল ব্যারাকুডা মাছ, রঙ্গতবাজার এলাকায় হোটেল দুর্গায় তারিনি মাছের ঝোল, গোয়ায় কোলাভা বিচ লাগোয়া শ্যাক-এ মৃদুমন্দ আলোয় স্কুইডের একটা দুর্দান্ত ডিশ, বেনারসের গোধুলিয়ায় রাবড়ি আর রামনগর ফোর্টের সামনের দোকানে প্রাণজুড়ানো লস্যি, বকখালিতে ঝুপড়ি হোটেলের কাঁকড়ার ঝাল... । বলতে বলতেই মনে পড়ল জয়ন্তীতে পি.এইচ. ই.-র বাংলোয় রাতে কেয়ারটেকারের রান্না গরম গরম হাতরুটি আর দেশি মুরগির ঝোল খেয়ে মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করতে সে খুব নিস্পৃহ গলায় উত্তর দিয়েছিল, হুম... টাবু ম্যাডাম-ও তাই বলেছিলেন (গৌতম ঘোষের 'আবার অরণ্যে' শুটিং-এ এসে)।]

আড্ডা বসালেন সুমিত নাথ আর শুনলেন থুড়ি পড়লেন দময়ন্তী দাশগুপ্ত -

♦ সুমিত নাথ – কোথাও বেড়াতে গিয়ে সেখানের কোনো বিশেষ খাবারের কথা বা কোনো দোকান/হোটেল-এ খাওয়ার অভিজ্ঞতা আপনাদের মনে রয়ে গেছে – এমন কিছু পোস্ট করুন – নিছক কৌতূহল।

♦ সোনালি দাস – লাভা থেকে সুনতালেখোলা যেতে রাস্তার হোটেলে মোমো বিক্রি হয়। দারুণ খেতে। নেপালিদের তৈরি মোমোর টেস্ট বাঙালিদের থেকে আলাদা। গেলে খেয়ে দেখবেন।

♦ পারিজাত ভট্টাচার্য – হরিদ্বারের দাদা-বৌদির হোটেলের আলুপোস্ত, গরম ভাত, কড়কড়ে আলুভাজা – বাড়ির থেকে দূরে ওই এক খাবার অতুলনীয়।
সিদ ব্যানার্জি – চেইল-এ শর্মাজীর ধাবা – ৫০ টাকায় ভরপুর পেটপুজো (২০১০-এর কথা বলছি)। ছোট্ট একটা ধাবা – একেবারেই চোখে পড়ার মত নয়। অথচ এমন কোন সেলিব্রিটি নেই যিনি এখানে খাননি। মোটামুটি ছ'টা ডিশ...হাতে বানানো গরম রুটি ঘি মাখানো...উফফফ...

♦ পারমিতা পাইন – আপার পেলিং-এ হেলিপ্যাড-এর সামনে সিকিমিজ পরিবারের দোকানে গরম গরম আলুর পরোটা আর চা।

♦ চন্দ্রিমা চৌধুরী – কেভেন্টার্স – দার্জিলিং...এদের খাবারের কথাতো নতুন করে কিছু বলারই নেই...বিখ্যাত। কিন্তু যিনি আমাদের সার্ভ করছিলেন সেই ভাইয়ার হাসিমুখ সবথেকে বেশি মনে পড়ে। বাইরে পঞ্চাশ-ষাট জন অপেক্ষা করছে। অথচ কী ঠাণ্ডা মাথায় পুরো চাপটা সামলাচ্ছিলেন একটুও বিরক্ত না হয়ে।

♦ অভীক রায় চৌধুরী – ছোটবেলায় বাবা-মার সঙ্গে আগ্রার মহারাজ হোটেলে গরম লাল টুকটুকে মাংসের ঝোল ভাত। পুরীর সাগরিকা হোটেলে শেষপাতে চিনি ছড়ানো টক দই। সম্প্রতি দিঘায় গীতাঞ্জলি হোটেলের ঘি দেওয়া আলুপোস্ত। শিলিগুড়ির কলেজ পাড়ার কাছে এক হোটেলে ধনেপাতার বড়া। আপাতত চলন্ত বাসে বসে বসে এই কটা মনে পড়ল।

লাভার পথের ধারে গরম-গরম মোমোর স্টল

♦ অরিজিৎ চক্রবর্তী – বহু বছর আগে একবার দুয়ারসিনি ঘুরতে গিয়েছিলাম। তখন অবশ্য ওই বাংলোগুলো খোলা ছিল। বাংলোর রাঁধুনী সাঁওতাল ছেলেটি (এখন আর নাম মনে নেই) আমাকে আর আমার বন্ধুকে তার শ্বশুরবাড়ি নিয়ে গিয়েছিল মহুয়া খাওয়াতে। সঙ্গে দিয়েছিল পেয়ারা পাতার মধ্যে একটু নুন আর একটু মুড়ি। সেই দিনটা আর ওদের সেই অতিথি আপ্যায়ন আমার সারা জীবন মনে থাকবে। যদি কোনদিন সুযোগ হয়... বাংলোটা খোলে... আবার যাব...তবে জানিনা ওই ছেলেটির সঙ্গে আর দেখা হবে কীনা। ♦ পায়েল ভট্টাচার্য চ্যাটার্জি – পুরী ২০১৪...তেরোপার্বণের পোলাও। বক্সা ফরেস্ট রিসর্টের লক্ষ্মীভোগ চালের ভাত।

♦ সৌম্যব্রত গুহঠাকুরতা – আগরতলায় গেলে অবশ্যই শঙ্করের হোটেলে ঢুঁ মারবেন। একেবারেই সাধারণ দেখতে একটা হোটেল কিন্তু মেনুর তালিকা বিরাট...দামও খুব বেশি নয়...সব অটোচালকেরাই হোটেলটা চেনে।

♦ গৌরাঙ্গ প্রসাদ ব্যানার্জি – ওড়িশার দালমা খুব স্বাদু।

♦ ডঃ সোমা নন্দা – সিমলার পেস্ট্রি আর সফটি দারুণ।

♦ কিরণ চৌধুরী - ব্যাংকক আর পাট্টায়াতে ব্রেকফাস্ট টেবিলের খাওয়া । জীবনে ভুলব না।

পুষ্কর বেদপ্রকাশ মিত্র – হৃষিকেশের কাছে আগ্রা

আন্দামানের রেস্তোরাঁয় সামুদ্রিক মাছের ডিশ

খাল বলে একটা ছোট জায়গা আছে ওখানের রাবড়ি খুব ভালো খেতে।

♦ বিশ্রুত সেন – তখন আমি ক্লাস টুতে পড়তাম...হোটেলের নাম মনে নেই...তবে দার্জিলিং এটা মনে আছে...হোটেলে খেয়ে খুব ভালোলেগেছিল। দীঘার বালুচরী হোটেলের খাওয়াও আগে খুব ভালো ছিল, এখন বাজে হয়ে গেছে।

♦ সুস্নিগ্ধা দাস – পুরীতে জগন্নাথ দেবের ভোগের রাবড়ি মালপোয়া সহ, আর অন্যরকম একটা মিষ্টি নাড়ু গজা...এককথায় অসাধারণ।

♦ বহ্নিশিখা ভট্টাচার্য – কালিম্পং মোড়ে পুলিশ স্টেশনের কাছে রাস্তার ধারের মোমো...। সিমলার পেস্ট্রি সম্বন্ধে আমিও একমত।

♦ প্রদীপ্ত কুমার সিংহ – শক্তিগড় ঘুরে আসুন... 'আদি ল্যাংচা ভবন'-এর ল্যাংচা খাবেন অবশ্যই।

♦ চৈতালি শীল – রাবাংলায় গিয়ে মোমো আর গ্যাংটকের এম জি মার্গে সিঙ্গারা চাট। কলকাতার মিলেনিয়াম পার্কে গ্রিলড চিকেন স্যান্ডুইচ ও ভজহরি মান্নায় নলেন গুড়ের আইসক্রিম।

♦ ইসির তাহা – সি নেস্ট ভাইজাগ। বাসস্ট্যান্ডের কাছে হলদোয়ানি সামা রেস্টুরেন্টের চিকেন কালি মরিচ। দিল্লিতে জামা মসজিদের কাছে করিম। হায়দ্রাবাদে চারমিনারের কাছে পিস্তা হাটের হালিম। সেকেন্দ্রাবাদে ইরানি কাফে।

♦ চৈতালি শীল – আমার যাওয়া হয়নি @ইসির কিন্তু হায়দ্রাবাদে চারমিনারের সামনে প্রতিটা স্ট্রিট ফুডের স্বাদই মনে রাখার মত।

♦ সুকুমার দাস – মুর্শিদাবাদ ঘুরতে গেলে অবশ্যই 'কান্দি' গিয়ে ওখানের 'মনোহরা' খাবেন... মন হারিয়ে যাবে।

♦ ইসির তাহা – বহরমপুরের ছানাবড়া।

♦ চৈতালি শীল – জনাইয়ের মনোহরাও খারাপ নয় তবে সব দোকানের না @সুকুমার।

♦ ইসির তাহা – দার্জিলিং-এ ম্যল-এর কাছে গ্লেনারিজ আর কেভেন্টার্স। শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের কাছে কল্পনা পাইস হোটেল।

♦ সুকুমার দাস – কলকাতার ফুচকা।

♦ দীপান্বিতা মজুমদার – কোলাঘাটের ধাবা...ব্যাপক।

সিকিমের গরম বিয়ার - ছাং (থুম্বা)

♦ চৈতালি শীল – আরে @সুকুমার কলকাতা ছাড়া ফুচকায় স্বাদ পাওয়া যায়না। শান্তিনিকেতনে খেয়েছিলাম পেঁয়াজ দিয়ে ফুচকা! ফুচকাপ্রেমীদের নাইটমেয়ার হয়ে যাবে।

♦ ইসির তাহা – কলকাতার ফুচকা – দ্য বেস্ট।

♦ চৈতালি শীল - @ দীপান্বিতা কোলাঘাটের ধাবা বলতে ব্রিজ পেরিয়ে একটা ধাবা আছে ওখানে খেয়েছিলাম ভালোই। @ইসির কোনদিন সাঁতরাগাছি এলে জগাছা থানার উল্টোদিকে কাসুন্দি ফুচকা খেয়ে যাবেন...গ্যারান্টি ভুলতে সময় লাগবে। @সুকুমার, গ্যাংটকের এম জি মার্গে একটা স্ন্যাক্সের দোকানে ফুচকা পাওয়া যায় আপনাকে নিজে বানিয়ে খেতে হবে, ওরা আলু-মশলা দিয়ে রেডি করে দেয়। কিন্তু মাখা নয়, আলুর তরকারিতে যেমন আলু থাকে তেমন। ভালোই লাগে খেতে।

♦ দেবশ্রী নন্দী – লাটাগুড়িতে অরণ্য বলে একটা হোটেল আছে ওখানের রেস্টুরেন্টে সত্যি এত ভালো রান্না মুখে লেগে থাকার মত। সব রান্নাই খুব ভালো। শুধু সেইজন্যই আবার যেতে হবে।

♦ সায়নী চৌধুরী – মুসৌরীর ম্যল-এ পেস্ট্রি...ইয়াম্মি।

♦ রত্না গুহ – মাইথনের জিলিপি দারুণ লেগেছিলো। অমৃতির মতো প্যাঁচ কিন্তু পাতলা। ব্রিজে ওঠার আগে ট্যুরিস্ট লজের কাছে।

♦ নিকেত সাহা – শিমুলতলার ছানা, ওয়ান (রূপকুণ্ডের পথে) এর ডালিয়া, চিত্রের মোমো...আরও অনেক এমন স্মৃতি আছে।

পঞ্চলিঙ্গেশ্বরের নীলগিরি সুইটস-এ 'পাশবালিশ'

♦ সিদ্ধার্থ কর্মকার – বহু আগে...১৯৭১ সালের কথা বলছি...আমি তখন কলেজে পড়ি...দ্বারকায় পুরী আর রাবড়ি খেয়েছিলাম...সে স্বাদ ভুলতে পারিনি।

♦ কণাদ চৌধুরী - পুরীর মন্দিরের প্রধান প্রবেশপথের ডানদিকে, মন্দিরের দেওয়ালের বাইরে কয়েকটা দোকান আছে, খুব ভাল রাবড়ি পাওয়া যায়। আর বাঁদিক দিয়ে যে রাস্তাটা স্বর্গদ্বারের দিকে গিয়েছে গজার দোকানগুলোর পাশ দিয়ে, সেই রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছি আমি আর আমার বড় মেয়ে, দেখলাম একটা দোকানের সামনে বেশ বড় একটা কালো কড়াই উনুনে বসানো, দুধ জ্বাল দেওয়া হচ্ছে, আর দুধের ওপর থেকে সাদা মত কিছু একটা তুলে শালপাতার বাটিতে পরিবেশিত হচ্ছে ক্রেতার কাছে। দাঁড়িয়ে গেলাম দুজনেই, কাছে গিয়ে দেখা গেল, দূর থেকে যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই, দুধের পুরু সর অদ্ভুত কায়দায় দুটো কাঠির সাহায্যে তুলে নেওয়া হচ্ছে কড়াই থেকে, চারভাঁজ করে শালপাতার বাটির ওপর রেখে অল্প একটু চিনি ছড়িয়ে হাতে তুলে দিল দোকানি, আঃ! কী দারুণ খেতে। কিছুদিন আগেই ঘুরতে গিয়েছিলাম পঞ্চলিঙ্গেশ্বর, যাওয়ার আগে ইন্টারনেট সার্চ করে নানা সাইট থেকে জেনে নেবার চেষ্টা করছি জায়গাটা কীরকম, হঠাৎ করেই পেয়ে গেলাম একটি বেড়ানো সংক্রান্ত ব্লগ, লেখক তার পঞ্চলিঙ্গেশ্বর বেড়ানোর অভিজ্ঞতা লিখতে গিয়ে, কাছেই নীলগিরির একটি মিষ্টির দোকানের নাম দিয়েছেন, সেই দোকানের মিষ্টি নাকী দারুণ। অতএব কী আর করা, বেরিয়ে ফেরার দিন নীলগিরি বাজারে খুঁজে বার করা হল দোকানটা, নাম "নীলগিরি সুইটস"। মিষ্টিতে মিষ্টিতে ছয়লাপ, নানান ধরনের সুস্বাদু মিষ্টির স্বাদ নেওয়া গেল, কিন্তু নজর কেড়ে নিলো, লম্বাটে এক রসগোল্লা, যার স্থানীয় নাম "পাশবালিশ"। দোকানের খবরটা যিনি দিয়েছিলেন, তাকে আর ধন্যবাদ জানানো হয়নি, তার কাছে চিরঋণী থেকে গেলাম। যাচ্ছিলাম রায়গোড়া থেকে চিত্রকোট, পথে একরাত কাটালাম কোরাপুটের সার্কিট হাউসে, রাত্রে শেষপাতে পাওয়া গেলো অপূর্ব স্বাদের

দারুণ রসগোল্লা। খোঁজ করা হল দোকানের, কোরাপুট বাজারের ভিতরে একটি হোটেলের নীচে মিষ্টির দোকান, হোটেলের নামটি এখন মনে নেই, কিন্তু মিষ্টির স্বাদ মুখে লেগে আছে এখনও।

♦ সুস্নিগ্ধা দাস - @কণাদ চৌধুরী...এই পঞ্চলিঙ্গেশ্বর যাওয়ার পথে ননীচোরা মন্দির পরে। ওখানের প্রসাদ মাটির ঘটিতে ক্ষীর আর বাইরে দোকানে খেলাম ছানাপোড়া ... দুর্দান্ত।

♦ সুস্মিতা সেনগুপ্ত - এনজেপি থেকে দার্জিলিং যাওয়ার পথে পশ্চিমবঙ্গ পর্যটনের একটা রেস্টুরেন্ট আছে সকলেই জানেন...দুর্দান্ত খাবার বানায়, দারুণ চা আর তেমনি ভাল মোমো। দার্জিলিং-এর কেভেন্টার্স-এর ব্রেকফাস্ট, গ্লেনারির কুকিজ...অবশ্যই খাবেন...না খেলে ঠকবেন। সিকিমের কোনো রোডসাইড দোকানে নুডলস স্যুপ...একদম আঞ্চলিক...অবশ্যই ট্রাই করবেন। সিকিমের গ্রামের মানুষ খুব অতিথিবৎসল আর বন্ধুভাবাপন্ন। সিকিমের যে কোনও গ্রামে গেলে ঘরে তৈরি শাশা ইত্যাদি খাওয়াবে...ওদের সঙ্গে ওদের ঘরে না গেলে বোঝা যায়না কত অল্পে, কত সুন্দরভাবে থাকেন ওরা। কর্ণাটক (বাঙ্গালোর) গেলে অবশ্যই ওদের স্থানীয় খিচুড়ি খেয়ে দেখবেন - নাম 'বিসি বেলে ভাত'...দারুণ লাগবে...লাঞ্চে খেলে এর সঙ্গে সাধারণত কার্ড রাইসও দেয়। দিল্লিতে অবশ্যই ফুচকা খাবেন... আলাদা দুরকম বলবেন...একটা মিষ্টি ফুচকা পাওয়া যায় একরকম চাটনি দিয়ে... ওখানের তেঁতুল জল হয়না...পুদিনা পাতার জল...একবার খেলে ওই অন্যরকম ফুচকা ভালোলাগতে শুরু করবে। তারাপিঠের দুপুরের ভোগ অনেকেই খেয়েছেন...সেটাও কিন্তু দারুণ :-) :-)

♦ রাজা সুদীপ্ত রায় চৌধুরী - অমৃতসরের জিলিপি আর কাটরার গুলাপজামুন।

গোয়ায় কোলভা বিচের পাশে শ্যাক-এ

♦ গৌতম ব্যানার্জি - তুণ্ডা বিরিয়ানি আর কাবাব - লখনৌ-এর আমিনাবাদ ও গোমতী নগরে, হজরতগঞ্জের বাস্কেট চাট, আমিনাবাদের প্রকাশ কুলফি দারুণ বিখ্যাত... খেতেই হবে।

♦ পার্থ সেনগুপ্ত - রাজস্থানের জয়সলমীরে কের সাংরি, ডাল বাটি চুরমা খেতে দারুণ লেগেছিল।

♦ সৌগত পাল - ঘাটশিলায় গণেশের কালাকাঁদ আর অযোধ্যা পাহাড়ে কাঁচা শাল পাতায় জড়ানো দেশি মুর্গি পোড়া...

♦ প্রতাপ বিশ্বাস - পুরীতে রাস্তার ধারে চা খেয়েছি অসাধারণ। অনেক জায়গাতেই রাস্তার ধারের ছোটখাটো দোকানের চা বেশ ভাল লেগে যায়, আবার কোথাও মুখেই তোলা যায়না। কিন্তু পুরী বা ভুবনেশ্বরে যতবার খেয়েছি খারাপ লাগেনি। চায়ের প্রসঙ্গ টেনে আনলাম আসলে বাঙালির চা নিয়ে একটা আলাদা ভাল লাগা আছেই। গড়পঞ্চকোটের পলাশবীথির আলুর দম খুব স্বাদু। কোলকাতায় মোহনবাগান ক্লাবের ক্যান্টিনের আলুর দম - ৮ টাকাতে এত ভালো আলুর দম আমি কোথাও খাইনি।

♦ হৈমন্তী পাল - সিকিমের রোডসাইড মোমো। দার্জিলিং-এর গ্লেনারিজ-এর কোনো পদ, মানালিতে বিপাশা নদীর ধারে গরম ম্যাগি। ইংলণ্ডের রোড শপ-এর গরম ডোনাট, কলকাতার রোল, ফুচকা...কত বলব...

♦ সুমিত নাথ - বাহ...প্রচুর কিছু জানতে পারলাম...কেউ এইসব জায়গায় বেড়াতে গেলে নিশ্চয় চেখে দেখবেন...গ্রুপের সব সদস্যদের অসংখ্য ধন্যবাদ।

দার্জিলিঙের সকাল - কেভেন্টার্স-এর ছাদে

= 'আমাদের ছুটি' বাংলা আন্তর্জাল ভ্রমণপত্রিকায় আপনাকে স্বাগত জানাই = আপনার বেড়ানোর ছবি-লেখা পাঠানো

বেড়ানোর মতই বইপড়ার আদতও বাঙালির চেনা সখ - তা ছাপা হোক বা ই-বুক। পুরোনো ভ্রমণ কাহিনিগুলির নষ্টালজিয়া তাতে এনে দেয় একটা অন্যরকম আমেজ। আজকের ভ্রমণপ্রিয় বাঙালি লেখক-পাঠকেরা অনেকেই শতাব্দী প্রাচীন এইসব লেখাগুলি পড়ার সুযোগ পাননি। 'আমাদের ছুটি'-র পাঠকদের জন্য পুরোনো সাময়িক পত্রিকার পাতা থেকে অথবা পুরোনো বইয়ের কিছু কিছু নির্বাচিত অংশ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে পত্রিকার পাতায়।

বাংলাদেশের প্রথমদিককার নারীবাদী হিসেবে লেডী অবলা বসু একটি পরিচিত নাম - তাঁর জন্ম ১৮৬৪ সালের ৮ আগস্ট। বাংলার মেয়েদের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে ১৯১৯ সালে 'নারী শিক্ষা সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অবলা। বিধবাদের স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে 'বিদ্যাসাগর বাণীভবন', 'মহিলা শিল্প ভবন' ও 'বাণীভবন ট্রেনিং স্কুল' নামক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। স্বামী প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসুর মৃত্যুর পর তাঁর সঞ্চিত এক লক্ষ টাকা দিয়ে 'অ্যাডাল্টস প্রাইমারি এডুকেশন' নামক প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন। ১৯৫১ সালের ২৬ এপ্রিল অবলা বসু কলকাতায় মারা যান। আমৃত্যু তিনি ছিলেন ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদিকা। ২০১৪ সাল তাঁর জন্মের সার্ধ-শতবর্ষ।
তৎকালীন নামী ইংরেজি পত্রিকা 'মর্ডান রিভিউ'-এ নারীশিক্ষা-নারীস্বাধীনতা বিষয়ক তাঁর একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। পাশাপাশি বিভিন্ন বাংলা সাময়িক পত্রিকায় বেরিয়েছিল তাঁর বেশ কিছু প্রবন্ধ এবং ভ্রমণ কাহিনি। জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে বহুবার দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করেন অবলা। তাঁর ছড়ানো ছিটানো গদ্য রচনাগুলির কিছু নিদর্শন একটিমাত্র সংকলনেই পাওয়া যায় - জগদীশচন্দ্র বসু ও লেডী বসুর প্রবন্ধাবলী নামে।
প্রথম জাপান ভ্রমণকারী বাঙালি মহিলা হরিপ্রভা তাকেদার 'বঙ্গমহিলার জাপানযাত্রা' বইটি প্রকাশিত হয় ১৯১৫ সালে। এর ঠিক পরে পরেই ১৯১৬ সালের প্রথমদিকে অবলার লেখা 'জাপান ভ্রমণ' কাহিনিটি সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাকেদা জাপান গিয়েছিলেন ১৯১২ সালে। অবলা বসু ১৯১৫ সালের মে-জুন মাস নাগাদ জাপান যান।

জাপান ভ্রমণ

অবলা বসু

এখন এসিয়া, কেবল এসিয়া কেন, সমগ্র জগতে জাপান এক মহাজাতি বলিয়া সভ্য জগতে গণ্য ও বরণীয়, কিন্তু অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে এই জাপানের নাম কেহ শুনে নাই। কি করিয়া এই জাতি এত অল্পদিনে এত উন্নতি করিল, ইহা জানিতে উৎসুক হইয়া আমি আমেরিকার কালিফর্ণিয়ার সানফ্রানিস্কো বন্দর হইতে এক খানি জাপানী জাহাজে জাপান যাত্রা করি। আমি ইহার পূর্ব্বে অনেক ইংরাজী জাহাজে যাতায়াত করিয়াছি বটে, কিন্তু জাপানী জাহাজে সামান্য কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত যে সৌজন্য ও ভদ্রতা দ্বারা আপ্যায়িত করেন, তাহা দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। তাঁহারা যাত্রীগণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি জাগ্রত দৃষ্টি রাখেন, অন্যান্য কোম্পানির জাহাজ অপেক্ষা অল্প ব্যয়ে কিন্তু তদপেক্ষা অধিক আরাম ও সুখে জাপানী জাহাজে যাতায়াত করা যায়। সুতরাং জাপানী জাহাজ কোম্পানী ধীরে ধীরে যে অন্যান্য প্রতিযোগী জাহাজ কোম্পানীকে পরাস্ত করিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে অদ্বিতীয় প্রভুত্ব স্থাপন করিবে, এখনই তাহার সূচনা দেখা যাইতেছে।
মধ্যে মধ্যে তার বিহীন টেলিগ্রাফ যোগে পৃথিবীর সংবাদ আমাদের জাহাজে আসিত, ভোজন সময়ে প্রত্যেকের আসনের নিকট সে সকল সংবাদের এক এক খণ্ড প্রতিলিপি প্রদত্ত হইত। আমাদের জাপান পৌঁছিবার দুই দিন পূর্ব্বে জাহাজ কোম্পানীর ডিরেক্টর একজন প্রসিদ্ধ ধনী জাপানী তারহীন টেলিগ্রাফ যোগে জাহাজের যাত্রীদিগকে তাঁহার বাটীতে নিমন্ত্রণ করিলেন। টোকিও পৌঁছিয়া প্রতি যাত্রী তাঁহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহার সৌজন্য ও যত্নে আপ্যায়িত হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, যে প্রতি সপ্তাহে তাঁহাদের জাহাজ বন্দরে আসিলেই প্রতি যাত্রী এইরূপে তাঁহার গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া নূতন দেশে বিদেশীয়ের আতিথ্যে মুগ্ধ হইয়া জাপানী জাহাজ ভিন্ন অন্য জাহাজে যাতায়াত করেন না।
ইয়াকোহামা বন্দরে অবতরণ মাত্র এই নূতন দেশটী আমাদের চক্ষে অতি মনোরম বোধ হইল। এ পর্য্যন্ত যত দেশ দেখিয়াছি, তাহা হইতে এই দেশ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের। পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কেহ জাপানের নাম শুনে নাই, যখন আমেরিকার জাহাজ বলপূর্ব্বক তাহাদের বন্দরে প্রবেশ করে, তখন তাহাদের চক্ষু ফুটিল এবং জ্ঞান জন্মিল, যে জাপান ভিন্ন অন্য দেশ আছে এবং সে দেশের লোক শৌর্য্যবীর্য্যে কিরূপ পরাক্রান্ত। তাহা দেখিয়া তাহারা আপনাদের সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধনে দৃঢ়সংকল্প হইল। ইয়ুরোপ ও আমেরিকা হইতে উপযুক্ত শিক্ষক আনাইয়া দেশে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিল। এতদ্ভিন্ন তাহারা শিক্ষার জন্য ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় দলে দলে যুবকদিগকে পাঠাইতে লাগিল; তাহারা কেহ মুটে, কেহ দৈনিক শ্রমজীবী হইয়া কেহ বা পাচক ও ভৃত্য হইয়া ভদ্র গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাদের রীতিনীতি শিখিত, কেহ বা কারখানা ও দোকানে কাজ শিখিত। এই ক্ষুদ্রকায় জাতির নম্রতা ও

বিনয়ে তুষ্ট হইয়া সকল দেশের লোকই তাহাদের ভালবাসিত। তখন কেহ স্বপ্নেও মনে করে নাই, যে এই জাতি জগতের অন্য সভ্য জাতির সহিত সমকক্ষতা করিবে বা একদিন তাহাদের শিক্ষকের স্থান অধিকার করিবে। নানা দেশ হইতে বহু লোক পূর্ব্ব দেশে অবস্থিত এই সুন্দর দেশ দেখিতে আসেন। আমাদের সঙ্গে দুই জন স্কটলণ্ডদেশীয়া নারী জাপানে যাইতেছিলেন, ইহার পূর্ব্বে একবার তাঁহারা ছয় মাস জাপানে বাস করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন চেরী ফুল ফুটিবার সময় নয়, সুতরাং সেই ফুল দেখিবার জন্য এই দ্বিতীয়বার তাঁহারা জাপান যাইতেছিলেন, ইহাতে বুঝিতে পারিবে, যে জাপান দেখিবার ঔৎসুক্য পৃথিবীর লোকের মনে আজ কাল কিরূপ প্রবল এবং দর্শকগণের আগমনে জাপানের আয় কিরূপ বৃদ্ধি হয়। যাহা হউক, এত অল্প দিনে ইহাদের এমন উন্নতি হওয়াতে ইহাদের মনে অহঙ্কার অতিশয় প্রবল হইয়াছে এবং বাহিরে ভদ্র ও বিনয়ী হইলেও ইহাদের অন্তরে অন্তরে ধারণা, যে পৃথিবীর মধ্যে ইহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং ইহাদের তুলনায় জগতের অন্য সকল জাতি বর্ব্বর মাত্র।

জাপান দেশটী প্রকৃতির এক রম্য কানন। ইহার প্রতি বৃক্ষলতা, প্রতি গিরিনির্ঝর, প্রতি গৃহ সৌন্দর্য্যময়। প্রকৃতিদেবী এই দেশের উপর তাঁহার ভাণ্ডারের সমুদয় সৌন্দর্য্য রাশি অজস্র ধারায় বর্ষণ করিয়াছেন, আর জাপানীরাও প্রকৃতিদেবীর যথার্থ ভক্ত উপাসক। প্রতি সুন্দর স্থান, ইঁহারা এমন পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও সুশোভন করিয়া রাখেন, যে তথায় গেলে আর তাহা ত্যাগ করিয়া আসিতে ইচ্ছা হয় না।

বন্দরে অবতরণ করিয়াই দেখিলাম, রিকস গাড়ীগুলি শ্রেণীবদ্ধ হইয়া শোভা পাইতেছে। প্রতি গাড়ী পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ঝক্ ঝক্ করিতেছে, তাহার কোন স্থান মলিন বা ছিন্ন নহে। ভাড়াও নির্দিষ্ট, তাহার জন্য কোন গোলমাল নাই। এক এক জন জাপানী এক একটী গাড়ী টানিয়া লইতেছে, তাহাতে কোন কষ্ট নাই। সেখানে রিকস গাড়ীই অধিক প্রচলিত, যাঁহারা অত্যন্ত ধনী, তাঁহাদের দুই চারি খানি ঘোড়ার গাড়ী আছে, সম্প্রতি মোটরেরও আবির্ভাব দেখা যায়, কিন্তু তাহার সংখ্যা অতি অল্প। আমেরিকা এক বিশাল দেশ, ইহার অট্টালিকা গুলি ষোল বা কুড়ি তল, রাজপথ গুলি যেন ঘোড়দৌড়ের মাঠ, প্রান্তর গুলি অনন্ত বিস্তৃত, এই সকল দেখিয়া আসিয়া যখন এই ক্ষুদ্র দেশে খর্ব্বাকৃতি মানুষ গুলি, তাহাদের অদ্ভুত বেশ ভূষা, তাহাদের কাষ্ঠ নির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাড়ী, কাগজের দ্বার, জানালা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতি বস্তু দেখিলাম, তখন বড় অদ্ভুত মনে হইল। কিন্তু এই খর্ব্বকায় মানবেরা অতিশয় পরিশ্রমী ও কর্ম্মঠ।

আমেরিকান পিতা মাতা সন্তানদের আদর দিয়া নষ্ট করেন, আমেরিকা থাকিতে আমার এই ধারণা হইয়াছিল, কিন্তু জাপানের সন্তান পালন প্রণালী আরও বিস্ময়কর। জাপানে ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত সন্তান দিগকে কোন প্রকার শাসন করা হয় না, তাহারা যাহা ইচ্ছা, তাহাই করে। মাতা কখনও সন্তানের গায়ে হাত তুলেন না। জাপান শিশুদেরই দেশ, শিশুদের এত আদর যত্ন আর কোথাও এমন দেখি নাই, রেলের গাড়ী বা সভা সমিতিতে দেখিয়াছি, বালক বালিকাদের বসিতে দিয়া স্থানাভাব হইলে বয়োজ্যেষ্ঠেরা দাঁড়াইয়া থাকেন, আমাদের চক্ষে ইহা অতিশয় বিসদৃশ বোধ হইত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, জাপানে সামাজিক শিষ্টাচারের নিয়ম অতিশয় কঠোর, জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইয়াছিলাম, যে ষোড়শ বৎসর বয়সে যখন সন্তানদিগকে সামাজিক সমুদয় নিয়মের সম্পূর্ণ অধীন হইতে হয়, তখন তাহাদিগকে তাহা শিক্ষা দিতে পিতা মাতাকে বিব্রত হইতে হয় না। তখন তাহারা বিনীত, বাধ্য ও পিতা ও মাতার সম্পূর্ণ অধীন হইয়া পড়ে; বিদ্যা, জ্ঞান ও কার্য্য সুচারুরূপে শিখিয়া দেশের ভক্ত সন্তান হইয়া জীবনের সকল কর্ত্তব্য পালন করে। সমগ্র দেশব্যাপী দুইটী উৎসব ইহাদের অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, একটী বালক ও অপরটী বালিকাদের উৎসব। গৃহে সন্তান জন্মগ্রহণ মাত্র এই উৎসবের সূত্রপাত হয়। বালকদিগের জন্য পুরুষগণের পুত্তলিকা ও বালিকাদের জন্য আদর্শ নারীদের পুত্তলিকা সকল প্রতিষ্ঠিত হয়। উৎসবের দিনে প্রতি গৃহ হইতে বাদ্যধ্বনি করিতে করিতে পুত্তলিকা গুলি রাজপথে বহির্গত হয় এবং বালক বালিকার প্রিয় নানা মিষ্টান্ন দ্রব্য প্রস্তুত হয়। বালকদিগের উৎসব যে মাসে হয়, সেই মাসের প্রথম হইতে যে বাড়ীতে যত পুত্র সন্তান আছে, ততগুলি রোহিত মৎস্যের প্রতিকৃতি বাঁশের উপর ঝুলিতে থাকে। জাপানীদের সংস্কার এই, রোহিত মৎস্য অতি বুদ্ধিমান ও তেজস্বী, তাহারা ঝরণার উপরেও গিয়া উঠিতে পারে, তাহারা আশা করে, পুত্রেরাও রোহিত মৎস্যের তুল্য তেজস্বী ও বুদ্ধিমান হইবে এবং বালকদের মনে এই ভাব মুদ্রিত করিবার জন্য কাগজে রোহিত মৎস্যের প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করিয়া অঙ্গনে বাঁশের উপর ঝুলাইয়া দেয়, কাগজের মাছগুলি যখন বায়ুভরে উড়িতে থাকে সে এক দৃশ্য। ইয়ুরোপীয় প্রথার অনুরূপ না হইলেও জাপানে নারীগণের স্বাধীনতা আছে, তাঁহারা প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া অবাধে যাতায়াত করেন, তাহাতে লজ্জা নাই। চাকরাণী না থাকিলে সন্তান গুলি লইয়া বাহিরে বেড়াইয়া আনা গৃহিণীরই কর্ত্তব্য। কিন্তু গৃহে সকল পুরুষের সঙ্গে ইঁহারা মিশেন না, গৃহস্বামীর বন্ধুগণ তাঁহার নিকটে আসেন, গৃহিণীর বন্ধুরা গৃহিণীর নিকট আসেন, কিন্তু বাটীর বাহির হইবার সময় স্ত্রীলোক ও পুরুষেরা একত্র বাহির হইয়া থাকেন। স্ত্রীলোকের অবরোধ প্রথা না থাকাতে সেখানে সকলের শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও সবল। রেল গাড়ী ও ট্রামে নারী ও পুরুষ অসঙ্কোচে যাতায়াত করিতেছে, দেখা যায়। জাপানীরা সৌন্দর্য্যের উপাসক। সাধারণ উদ্যান বা বিশেষ বিশেষ নগরে বিশেষ বিশেষ ফুল ফুটিবার সময় সহস্র সহস্র নর নারী পুত্র কন্যা লইয়া সেই শোভা দেখিতে আগমন করে। তখন সেই সাধারণ উদ্যান লোকে লোকারণ্য হয় এবং বালক বালিকাদিগের প্রফুল্ল মুখশ্রী ও পরিচ্ছদের শোভায় সেস্থান আরও রমণীয় হইয়া উঠে। জাপানী নারী শিক্ষিতা, পরিশ্রমকুশলা ও গৃহকার্য্যে নিপুণা। তাহাদের বসন ভূষণের আড়ম্বর নাই। রাজ পরিবারস্থ মহিলা বা অতিশয় ধনবানের গৃহের নারীগণ ব্রোচ বা শিরোভূষণ ধারণ করেন বটে, কিন্তু তাহা রাজকীয় উৎসব ব্যাপারে, সাধারণ সময়ে নহে। আমি প্রিন্স আখ্যাধারী এক ধনী পরিবারে চা পান করিতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম; তাঁহার পত্নীর মণিবন্ধ, কণ্ঠ, কি শরীরের অপর কোন স্থানে কোন অলঙ্কার দেখিলাম না। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবারের নারীগণেরও সেইরূপ, তাঁহাদের পরিচ্ছদ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, সংযত ও সর্ব্বপ্রকার বাহুল্য বর্জ্জিত। কাহাকেও অলঙ্কার ধারণ করিতে দেখি নাই। আমার চক্ষে জাপানী পুরুষ বা নারী কাহাকেও সুন্দর মনে হয় নাই। তাহাদের শরীরের কোথাও অলঙ্কার ব্যবহার করিতে দেখি নাই। তাহাদের বর্ণ গৌর; কিন্তু কোটরগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষু এবং গণ্ডস্থল উচ্চ। জাপানী পুরুষ ও নারীর পরিচ্ছদে বড় পার্থক্য নাই, স্ত্রীলোকেরা পৃষ্ঠদেশে রেশমী ফিতায় নির্ম্মিত একটী জিনিস পরিধান করেন, তাহাতে এই খর্ব্বাকৃতি নারীদের আরও খর্ব্ব দেখায়। এই বস্তুটীর মূল্য ৫ হইতে ৫০ টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারে, ইহাই জাপানে ধনী ও দরিদ্রের বিভিন্নতা প্রকাশ করে। জাপান এমন সুন্দর দেশ, তাহার অধিবাসীরা প্রতি কার্য্যে তাহাদের সৌন্দর্য্য জ্ঞান ও মার্জ্জিত রুচির এমন সুন্দর পরিচয় দেয়, কিন্তু তাহাদের পরিচ্ছদে সে উন্নত রুচির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

জাপানীদের গৃহস্থালী অতি সুন্দর; কাঠের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর, জানালা ও দ্বার কাগজের, ঘরের মেজে মাদুরে আবৃত, মাদুর প্রায় এক হাত পুরু, তাহার উপর তাহারা পুরু আসন বা প্রশস্ত চতুষ্কোণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গদির উপর জানু পাতিয়া বসে। বিছানা, কাপড় চোপড় গুছাইয়া দিনে দেওয়ালের মধ্যের দেরাজে রাখে, রাত্রিতে দেরাজ হইতে বাহির করিয়া মেজেতে বিছানা পাতিয়া শয়ন করে। আমাদের মত তাহাদের গৃহে আবশ্যক, অনাবশ্যক গৃহসজ্জার প্রাচূর্য্য নাই। এই জাতি যেমন পরিষ্কার, তেমন শৃঙ্খলাপ্রিয়; গৃহসজ্জা বাসন প্রভৃতির বাহুল্য নাই বটে, কিন্তু যে কয়টী আছে, তাহা সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন, প্রতি গৃহস্থের বাটীতে কূপ আছে এবং জল তুলিবার জন্য পাম্প আছে, তাহা বাঁশ ও কাষ্ঠ নির্ম্মিত; বাঁশের নল দিয়া স্নান ও রন্ধনগৃহে জল যায়। ইহাদের রন্ধন প্রণালী অতি সহজ, সমুদয়ই প্রায় সিদ্ধ করা, তাহা চাটনী দিয়া খায়। জাপানিরা ভাত বেশী খায়, মাছ ত কাঁচাই অধিক খায়। তাহাদের মিষ্টান্ন দ্রব্যের প্রধান উপকরণ চাউলের গুঁড়া, এই গুলি অতিশয় উপাদেয়। আমরা হাত দিয়া ভাত খাই, কিন্তু জাপানীরা তাহা অতিশয় ঘৃণা করে, তাহারা দুইটী কাঠি দিয়া খায়। তাহারা আপামর সাধারণ সকলে জুতা ও মোজা ব্যবহার করে এবং দেশ দরিদ্র বলিয়া জুতার পরিবর্ত্তে খড়মও পরিয়া থাকে। জুতা দ্বারে রাখিয়া ঘরে প্রবেশ করিবার নিয়ম, বিদেশীয়গণ যাঁহারা বাঁধাজুতা পরেন, তাহাদের জুতার উপর কাপড়ের জুতা পরাইয়া তাঁহাদের গৃহ মধ্যে লওয়া হয়।

জাপানে প্রতি বালক বালিকা প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিতে আইন অনুসারে বাধ্য। তাহার জন্য সেখানে প্রত্যেকে লিখিতে ও পড়িতে পারে। প্রতি পল্লীতে স্কুল আছে, বেতন অতি অল্প ।০ ।৶০ কি ।।০ । তাহাদের শিক্ষাদান প্রণালী অতি সুন্দর এবং দিন দিন তাহা উন্নতি লাভ করিতেছে। বালক বিদ্যালয়ে বালকেরা প্রতি মাসে একবার কি তিন মাস অন্তর একবার পিঠে বোঁচকা বাঁধিয়া শিক্ষকের সঙ্গে দেশভ্রমণে বাহির হয়। তাহাতে তাহারা দেশের কোথায় কি আছে, জানিতে পারে। পুস্তকে পঠিত ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে এবং দেশের কোন কীর্ত্তি বা জাতীয় গৌরবজনক অনুষ্ঠান দেখিয়া জাতীয় গৌরবে তাহাদের মন উদ্দীপ্ত হয় ও সেরূপ কার্য্য করিতে তাহাদেরও মনে প্রবল আকাঙ্খা জন্মে, সুতরাং এরূপ শিক্ষার মূল্য অনেক। বালিকা বিদ্যালয়ে লিখিতে পড়িতে শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে নারীর দৈনন্দিন জীবনের করণীয় সমুদয় কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়। রন্ধন, বস্ত্র পরিষ্কার, হিসাব রক্ষা, সামাজিক সৌজন্য প্রকাশের সমুদয় রীতিনীতি, ফুল সাজাইবার প্রণালী, চা পানে নিমন্ত্রণ করিবার সমুদয় নিয়ম শিক্ষা দেওয়া হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জাপান বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে আপনাদের জাতীয় জীবনের সর্ব্ব বিভাগে দ্রুত উন্নতি করিয়াছে। জাপান তাহার রণতরীর সাহায্যে ইংলণ্ডের বাণিজ্য রক্ষা করিতেছে। ইংরাজ জাপানের সহায়তা পাইয়াই প্রশান্ত মহাসাগরে নিরাপদে যাতায়াত করিতেছে। ইংরাজ বিপুল রণতরীর প্রভাবে সমুদ্রে যাতায়াত একচেটিয়া করিয়া জার্ম্মাণ জাহাজ সকল Kiel canal-এ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। জাপানের সাহায্যেই ইংরাজ প্রশান্ত মহাসাগরের উপনিবেশ সকল রক্ষা করিতে পারিয়াছে, ইহা জাপানের সামান্য গৌরবের কথা নহে। শিক্ষাপ্রণালীর গুণেই জাপান অল্প দিনে এমন উন্নতি করিতে পারিয়াছে। স্বদেশের প্রতি প্রেম ইহাদের অস্থি মাংস মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। তাহারা দেশের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। দরিদ্র দেশ হইলেও তাহাদের অধিক পরিমাণে রাজস্ব দিতে হয়, কিন্তু তাহা তাহারা আনন্দে দেয়। এই অনুপম স্বদেশপ্রীতি সমুদয় জাতিকে একতা বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার - রবীন্দ্রভবন গ্রন্থাগার, শান্তিনিকেতন

[অন্ত্রতে কিছু কিছু বাংলা বানান টাইপের অসুবিধাটুকু বাদ দিলে মূল বানান ও বিন্যাস অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। - সম্পাদক]

কেমন লাগল : - select -

মত দিয়েছেন : 14

গড় : 4.86

Like 5 people like this. Be the first of your friends.

tell a Friend

[আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন]

ধন্যবাদ সুবীরবাবু। ভ্রমণ কাহিনির লেখিকা হিসেবে অবলা বসুর প্রায় হারিয়ে যাওয়া লেখাগুলির পুনরুদ্ধার এবং পুনর্মূল্যায়ণের একটা কাজ করছি আপনিতো জানেনই, "পরশপাথর" প্রকাশনা থেকে বই আকারে বেরোনোর একটা কথা চলছে। এই "জাপান ভ্রমণ" লেখাটিকে উদ্ধার করতেই 'না ভ্রমণে' আমরা শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলাম। এরই মাঝে চোখে পড়ল পুজোসংখ্যা 'ভ্রমণ' পত্রিকার সঙ্গে বিনামূল্যে খুব অযত্নে বানান ভুল সহ ছাপা অবলা বসুর কয়েকটি ভ্রমণ কাহিনি জগদীশচন্দ্র বসুর নামে। আমারই লজ্জায় মাথা নীচু হয়ে গেল।

- দময়ন্তী [2014-10-22]

এককথায় অসাধারণ। আমরাতো দেশ বিদেশে অনেক ঘুরি, বিদেশের কথা ছেড়েই দিলাম, লেখিকার জাপান ভ্রমণের ঠিক এক শতাব্দী পরেও নিজেদের দেশটাকেও চিনলাম কই? মাত্র একশত-একশত পাঁচ পঙক্তিতে গোটা দেশটার শিক্ষাব্যবস্থা, আতিথেয়তা, সংস্কৃতি, দেশপ্রেমের বর্ণনা আর কারো লেখায় দেখা গেছে কিনা আমার জানা নেই। তা আবার এক শতাব্দী পূর্বে। এক নিশ্বাসে লেখাটা নীরবে পড়ে, আনন্দের থেকে নিজেদের আচরনে লজ্জাই পেলাম বেশী। এই জাতীয় লেখা প্রকাশ করার জন্য আমাদের ছুটি পত্রিকাকে ধন্যবাদ। আশ্চর্য লাগে এর পরেও সাধারণ সদস্যদের পত্রিকার সমালোচনাগুলো পড়ে। ধন্যবাদ দময়ন্তী।

- Subir Kumar Basu [2014-10-22]

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com

© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu

Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

বেড়ানোর মতই বইপড়ার আদতও বাঙালির চেনা সখ - তা ছাপা হোক বা ই-বুক। পুরোনো ভ্রমণ কাহিনিগুলির নস্টালজিয়া তাতে এনে দেয় একটা অন্যরকম আমেজ। আজকের ভ্রমণপ্রিয় বাঙালি লেখক-পাঠকেরা অনেকেই শতাব্দী প্রাচীন এইসব লেখাগুলি পড়ার সুযোগ পাননি। 'আমাদের ছুটি'-র পাঠকদের জন্য পুরোনো সাময়িক পত্রিকার পাতা থেকে অথবা পুরোনো বইয়ের কিছু কিছু নির্বাচিত অংশ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে পত্রিকার পাতায়।

১৮৬৪ সালে বহরমপুরের কাজলাগ্রামে (অন্যমতে নদীয়ার চুয়াডাঙ্গায়) কৃষ্ণভাবিনীর জন্ম হয়। দশ বছর বয়সে কলকাতা , হাইকোর্টের উকিল শ্রীনাথ দাসের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ দাসের সঙ্গে বিবাহ। দেবেন্দ্রনাথ নিজে উচ্চশিক্ষিত ছিলেন এবং নিজের আদর্শ ও শিক্ষায় স্ত্রীকে গড়ে তোলেন। দেবেন্দ্রনাথ যখন ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য প্রথমবার বিলেত যান তখনই কৃষ্ণভাবিনী দুই সন্তানের মা। দেবেন্দ্রনাথ বিলেত থেকে ফিরে আসার আগেই তাঁদের প্রথম সন্তানের মৃত্যু হয়। দেবেন্দ্রনাথ যখন দেশে ফেরেন তখন তাঁদের কন্যা তিলোত্তমার বয়স পাঁচ। বিলেত ফেরত ছেলেকে ত্যজ্যপুত্র করেন শ্রীনাথ। দেবেন্দ্রনাথও আবার পাড়ি দেন বিলেতে। এবারে সঙ্গী স্ত্রী কৃষ্ণভাবিনী। কিন্তু শ্রীনাথের আপত্তিতে কন্যা তিলোত্তমা রয়ে যায় ঠাকুরদাদার কাছেই। মাত্র দশ বছর বয়সে তার বাবা-মায়ের অমতেই তিলোত্তমার বিয়ে দিয়ে দেন শ্রীনাথ। এই বিবাহ সুখের হয়নি। আট বছর বিলেতে থাকার পর ফিরে এসেও আর মেয়ের সঙ্গে মায়ের নতুন করে কোন যোগসূত্র তৈরি হয়নি। ১৯০৯ সালে কৃষ্ণভাবিনী পরপর স্বামী ও কন্যাকে হারান। এরপর যে দশ বছর কৃষ্ণভাবিনী বেঁচেছিলেন, জনসেবা, স্ত্রীশিক্ষার প্রসার, বিধবাশ্রম ও পতিতাশ্রম নির্মাণে কেটেছিল।
ইংলন্ডে থাকাকালীনই কৃষ্ণভাবিনী তাঁর একমাত্র গ্রন্থ 'ইংলন্ডে বঙ্গমহিলা'-র পাণ্ডুলিপি প্রকাশের জন্য কলকাতায় পাঠান এবং তা ১৮৮৫ সালে প্রকাশিত হয়। এই বইটিই বাংলাসাহিত্যে মহিলার লেখা প্রথম ভ্রমণগ্রন্থ এবং প্রথম বিদেশ ভ্রমণ কাহিনি। দেশে ফিরে দীর্ঘকাল বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় কৃষ্ণভাবিনী সামাজিক-রাজনৈতিক প্রবন্ধের পাশাপাশি ছোটদের জন্যও লিখেছিলেন। এর মধ্যে কয়েকটি রচনায় ইংলণ্ড ভ্রমণের স্মৃতি ফিরে এসেছে। তেমনই একটি লেখা 'বিলাতের গল্প'। কিন্তু আর কখনও অন্য কোথাও বেড়াতে গিয়ে নতুন ভ্রমণ কাহিনি লেখেননি। ১৯১৯ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। ২০১৪ সাল তাঁর জন্মের সার্ধ শতবর্ষ।

বিলাতের গল্প

কৃষ্ণভাবিনী দাস

আমাদের দেশের যেমন কলিকাতা, বিলাতের সেই রকম রাজধানী লণ্ডন। লণ্ডনের মত প্রকাণ্ড নগর পৃথিবীর আর কোন দেশে নাই। উহা কলিকাতার চারগুণ বড়, আর সেখানকার লোক সংখ্যা কলিকাতার আট গুণ। আমাদের দেশে অনেক পাড়াগেঁয়ে লোক প্রথম প্রথম সহরে এসে - "ও বাবা! রাস্তায় এত ভিড়" - বলিয়া চমকিয়া যান; কিন্তু তাঁহারা এক বার বিলাতের রাজধানীতে গেলে এক পা চলিতেও থমকাবেন - সেখানে এমনি লোকের ঠেলাঠেলি!

আবার লণ্ডন এত বড় ও লোকপূর্ণ হলেও এখনও উহার শেষ নাই। আমাদের যেমন ভবানীপুর, শ্যামবাজার প্রভৃতি সবার্বের যোগে কলিকাতা ক্রমে বাড়িতেছে, লণ্ডনও ঐরকম চারিদিকের ছোট ছোট পল্লীতে মিশিয়া দিন দিন আরও প্রকাণ্ড হইয়া পড়িতেছে। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে উহার চারি পাশে যে সকল মাঠ ছিল, এখন সেখানে ঘাসের পরিবর্ত্তে অসংখ্য বাড়ী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, দেখে বিশ্বাস হয় না, যে কয়েক বৎসর আগে সে স্থান একেবারে পাড়া গাঁ ছিল।

বাহির হইতে দেখিতে বিলাতের রাজধানীটী বড় সুন্দর নয়। উহাতে আমাদের সহরের মত ধপধপে চুণকাম করা বড় বড় বাড়ী নাই, আর তাহাতে সবুজ খড়খড়ের বাহারও নাই। যেখানে যাও দেখিবে রাস্তার দুই পার্শ্বে কেবল এক রকম ধোঁয়াটে রঙের কাল কাল বাড়ী, সার বেঁধে দাঁড়াইয়া আছে। আমাদের দেশের মত বাড়ী গুলির মধ্যে খোলা জায়গা বা কিছুমাত্র ফাঁক নাই। আবার সব রাস্তার দুই পার্শ্বে যেমন সার গাঁথা বাড়ী, অনেক রাস্তার দুই পার্শ্বে তেমনি কেবল দোকান - এমন বাড়ী ও দোকানের মালা এ দেশে নাই। বোধ হয়, কলিকাতায় সবশুদ্ধ যত বাড়ী আছে, লণ্ডনে শুধু দোকানের সংখ্যা তার চেয়ে অনেক বেশী। রাত্রিতে দোকানের শোভা দেখিতে বড় চমৎকার হয়; সে দেশে অতি সুন্দর ও পরিপাটী রূপে দোকান সাজায়, আর গ্যাস বা ইলেকট্রিক আলোতে ভিতরের সব জিনিস ঝক্ ঝক্ করিতে থাকে।

লণ্ডন অতি প্রকাণ্ড সহর বলিয়া ডাকিবার সুবিধার জন্য উহাকে উত্তর, পূর্ব্ব, পশ্চিম, মধ্য প্রভৃতি আট ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ঐ নগরে তোমাদের কোন বন্ধুকে চিঠি লিখিতে হলে বাড়ীর নম্বর ও রাস্তার নাম ছাড়া কোন্ ভাগে সে রাস্তা আছে, তাহাও লিখে দিতে হয়। লণ্ডনের পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে অধিকাংশ বড় মানুষেরা থাকে - ঐ ভাগের রাস্তা গুলি অন্যান্য ভাগের চেয়ে ভাল বাঁধান ও অতি পরিষ্কার, আর দোকান সকলও অধিক দামী জিনিসে সাজান। মহারাণী ও যুবরাজের প্রাসাদ এই ভাগে আছে।

পূর্ব্ব-মধ্য ও পশ্চিম-মধ্য ভাগে যত কাজের স্থান; পশ্চিম-মধ্য ভাগে অনেক স্কুল, কলেজ, থিয়েটার ও বড় বড় আপিস আছে, আর দোকানেরও ত ছড়াছড়ি। পূর্ব্ব-মধ্য ভাগকে 'সিটি' বলে। ঐ স্থানটী দেখিলে কলিকাতার বড়বাজারের কথা মনে পড়ে। অবশ্য, আমাদের বড়বাজারের মত উহা অত অপরিষ্কার নয়। যত ব্যঙ্ক, বড় বড় কারখানা ও আড়তে 'সিটী' পূর্ণ; প্রতি বাড়ীতেই অনেক দোকান বা আফিস আছে; আর এক একটী বাড়ী সাত আট তালা উঁচু - কাজেই বুঝিতেছ জায়গার কি টানাটানি। ঐ ভাগে অনেক ছোট ছোট গলি ও সরু রাস্তা আছে। আর দু পাশের বাড়ী গুলি প্রকাণ্ড বটে কিন্তু এত কাল যে, মনে হয়, কেউ উহাদের গায়ে পাঁক লেপে দিয়েছে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। বিলাত শীতের দেশ বলিয়া প্রায় বার মাসই সব লোকের বাড়ীতে, ঘরে, দেয়ালের গায়ে কয়লার আগুন জ্বলে, - বিশেষ লণ্ডনে অনেক বড় বড় কারখানা আছে বলিয়া প্রত্যহ যত ধোঁয়ানল (চিমনী) থেকে রাশি রাশি ধোঁয়া বাহির হয়, শীতকালে সেই সব ধোঁয়া উপরে উঠিতে পারে না, বাড়ীর গায়ে ও গাছ পালায় লাগিয়া সব কাল করিয়া দেয় - এই কারণেই বাহির থেকে দেখিতে লণ্ডন এত কাল।

আমাদের দেশে দুর্গা পূজার ভাসানের দিন রাস্তায় যেমন লোকের ও গাড়ীর ভিড় হয়, সে বড় বড় রাস্তায় রোজই সেই রকম ভিড় হয়ে থাকে। রাস্তায় এত লোক ও গাড়ী ঘোড়ার ঠেলা ঠেলি যে খুব সাবধানে চলিতে হয়, ও অনেক সময় দাঁড়িয়ে থাকিতে হয়।

কলিকাতার ইডন গার্ডেনের মত লণ্ডনে অনেক গুলি সুন্দর বেড়াইবার স্থান আছে; উহাদের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়টীর নাম রিজেন্টস্ পার্ক; উহা লণ্ডনের উত্তর পশ্চিম ভাগে স্থিত ও বেড়ে প্রায় দেড় ক্রোশ। শীতকালে ঐ খানে বেড়াতে তত আমোদ নাই; সব গাছ পাতা-শূন্য, কোন রকমের ফল ফুল নাই। জমিতে কেবল শুকনা ঘাস - দূর থেকে দেখিলে যেন গা শিউরে উঠে। কিন্তু একবার যদি তোমরা ভিতরে যাও তাহা হলে আর বাহিরে আসিতে চাহিবে না। মাঠের উপর কত ছেলেমেয়ে দড়ি ডিঙ্গিয়ে লাফাচ্ছে ও ব্যাট বল খেলা করছে। ঝিলের জলে রাজহাঁস, পাতি হাঁস, পেরু প্রভৃতি নানা রকম জলচর জন্তু সাঁতরে বেড়াচ্ছে, আর ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা মা বাপ বা ঝিয়ের সঙ্গে এক এক ব্যাগ পুরিয়া রুটি এনে ঐ হাঁস প্রভৃতিকে খেতে দিচ্ছে।

পার্কের ভিতর কোন স্থানে বা জল একটু জমিয়া গিয়াছে আর বড় বড় ছেলেরা তার উপর হড় হড় করে পা সড়কিয়া 'স্লাইড' করছে, ঐ রকম খেলিতে খেলিতে কেউ বা পা পিছলিয়া পড়িয়া গেল, আর তার চারিদিকের লোক হো হো করে হেসে উঠল। তার কিন্তু হাসা বা লাগার প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই, সে আবার উঠিয়া স্লাইড করিতে লাগিল। এই সবে নবেম্বর মাস এখনও পার্কের বড় বড় ঝিল জমিয়া যায় নাই, নহিলে পোষ মাঘ মাসে বরফের উপর ছেলেদের স্কেটিংএয়ের ধূম দেখে কে? এই সব নানা রকম ক্রীড়া ও আমোদ দেখে মন এমন ভুলিয়া যায় যে, শীতে হাত পা কাঁপিলেও ঐ বাগান ছাড়িয়া বাড়ী ফিরিতে ইচ্ছা করে না।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার - সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশাল সায়েন্সেস, কলকাতা

[অত্রতে কিছু কিছু বাংলা বানান টাইপের অসুবিধাটুকু বাদ দিলে মূল বানান ও বিন্যাস অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। - সম্পাদক]

কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Sign Up to see what your friends like.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

বেড়ানোর মতই বইপড়ার আদতও বাঙালির চেনা সখ - তা ছাপা হোক বা ই-বুক। পুরোনো ভ্রমণ কাহিনিগুলির নস্টালজিয়া তাতে এনে দেয় একটা অন্যরকম আমেজ। আজকের ভ্রমণপ্রিয় বাঙালি লেখক-পাঠকেরা অনেকেই শতাব্দী প্রাচীন এইসব লেখাগুলি পড়ার সুযোগ পাননি। 'আমাদের ছুটি'-র পাঠকদের জন্য পুরোনো সাময়িক পত্রিকার পাতা থেকে অথবা পুরোনো বইয়ের কিছু কিছু নির্বাচিত অংশ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে পত্রিকার পাতায়।

বাংলাদেশের বাসন্তীর বাখরগঞ্জে ১৮৬৪ সালের ১২ অক্টোবর কামিনী রায়ের জন্ম হয়। তাঁর পিতা ছিলেন সাবজজ চণ্ডীচরণ সেন। কামিনী বেথুন কলেজ থেকে বি.এ. পাস করে ওই কলেজেই সংস্কৃতের অধ্যাপিকা নিযুক্ত হন। মাত্র পনেরো বছর বয়সে লেখা 'আলো ও ছায়া' কাব্যগ্রন্থটি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকাসহ ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই তাঁর কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৯৪ সালে ব্রাহ্মনেতা কেদারনাথ রায়ের সঙ্গে বিবাহ হয়। ১৮০৯ সালে স্বামীর এবং তার চার বছর পর জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু হয়।

পরবর্তীকালে কামিনী রায় সমাজসেবা ও জনহিতকর কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচালনায় তিনি যুক্ত ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগে তাঁর লেখা 'তোরা শুনে যা আমার' গানটি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জগত্তারিণী পদকে কামিনী রায়কে সম্মানিত করে। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ সভানেত্রী (১৯৩২-৩৩) ছিলেন। ১৯৩৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর কলকাতায় কামিনী রায়ের মৃত্যু হয়। ২০১৪ সাল তাঁর জন্মের সার্ধ শতবর্ষ।

দার্জিলিং নিয়ে কামিনী রায়ের লেখা হয়তো একমাত্র ভ্রমণ কাহিনির প্রথম অংশটুকু বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। লেখিকার সম্পর্কে সম্পাদকের মন্তব্য থেকে জানতে পারি লেখাটি 'বঙ্গমহিলা সমাজের কুমারী কামিনী সেন বি এ.র পঠিত হিমালয় ভ্রমণ প্রস্তাব হইতে গৃহীত'। কামিনী ১৮৮৬ সালে বেথুন কলেজ থেকে বি.এ.পাস করেন। এই লেখাটি প্রকাশ হয়েছিল অক্টোবর ১৮৮৬ তে। আমার বিশ্বাস সেই সময়ের কলকাতায় কামিনী সেন নাম্নী আর কোন বি.এ.পাস লেখিকা ছিলেন না অর্থাৎ এই ভ্রমণকাহিনির লেখিকা কামিনী সেনই বিবাহ-পরবর্তী সময়ে কবি কামিনী রায় নামে পরিচিত হন। দুঃখের বিষয় এই ভ্রমণ কাহিনিটি একটিমাত্র সংখ্যায় বেরোনোর পর 'ক্রমশ' লেখা থাকা সত্ত্বেও আর প্রকাশিত হয়নি। আমি পত্রিকাটির পরবর্তী অনেকগুলি সংখ্যা তন্নতন্ন করে খুঁজেছি, বামাবোধিনীর সূচিপত্রের সংকলনেও কোথাও দ্বিতীয় কোন সংখ্যায় এই লেখাটির উল্লেখ নেই। সমসাময়িক অন্য কোন পত্রিকাতেও লেখাটির পরবর্তী কোন অংশ প্রকাশিত হয়নি। কবি কামিনী রায়ের গদ্য সংকলন যা পেয়েছি সেখানেও কোন ভ্রমণ কাহিনির উল্লেখ নেই। আদৌ তিনি কোন ভ্রমণ কাহিনি লিখে গেছেন বলেই কোথাও কিছু পাইনি। অথচ সম্পাদকের উক্তি থেকে বোঝা যায় 'হিমালয় ভ্রমণ প্রস্তাব' বলে পূর্ণাঙ্গ একটি ভ্রমণ রচনার সামান্য অংশই এই লেখা। তাহলে মূল লেখাটি গেল কোথায়? কামিনী রায়কে নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন বা করছেন তাঁদের সংগ্রহে এই লেখা বা অন্য ভ্রমণলেখা থাকলে তা জানালে নিতান্তই বাধিত হব।

দার্জ্জিলিং ভ্রমণ

কুমারী কামিনী সেন

দার্জ্জিলিঙ্গের নাম বামাবোধিনীর পাঠিকারা সকলেই শুনিয়াছেন। এই সুরম্য পার্ব্বত্য নগরের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিয়া অল্প পরিমাণেও তাহা অপরের হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারি, আমার এমন সাধ্য নাই। বিশেষতঃ যেরূপ চক্ষু এবং যেরূপ হৃদয় লইয়া বিধাতার বর্ণনাতীত রচনা কৌশল পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়, আমার চক্ষু সৌন্দর্য্যানুভবে তদ্রূপ শিক্ষিত বা হৃদয় সেই সৌন্দর্য্য সম্যক উপভোগ করিবার পক্ষে তদনুরূপ উন্নত হয় নাই। সুতরাং দার্জ্জিলিঙ্গের সৌন্দর্য্যের অতি অল্পই আমি নিজে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছি।

ভারতবর্ষের মানচিত্রের শিরোভাগে হিমাচল নামে যে মহান্ পর্ব্বতপ্রাচীর পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেখা যায়, উহার একটি ক্ষুদ্র অংশে দার্জ্জিলিং সংস্থাপিত। হিমাচল পর্ব্বতকে হিন্দু কবিগণ নগাধিরাজ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষেও হিমালয় পর্ব্বতদিগের রাজা। ইহার ন্যায় প্রকাণ্ড পর্ব্বত পৃথিবীতে আর দেখা যায় না। ইহার দৈর্ঘ্য ১৫০০ মাইল এবং প্রস্থ ২০০ মাইল। ইহার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ গৌরীশঙ্কর অথবা এবারেষ্ট সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ২৯০০২ ফিট উচ্চ। এবারেষ্ট নামক জনৈক ইয়োরোপীয় সর্ব্বপ্রথম এই শৃঙ্গের উচ্চতা নির্ণয় করেন বলিয়া তাঁহারই নামানুসারে ইয়োরোপীয়গণ ইহাকে অভিহিত করেন। উচ্চতায় দ্বিতীয় স্থানীয় এবং দার্জ্জিলিঙ্গের প্রধান আকর্ষণ কাঞ্চন জুংঞা। কাঞ্চন জুংঞা অর্থ পঞ্চ হিমাধার। এর উচ্চতা, সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ২৮১৭৬ ফিট। কাঞ্চন জুংঞা নেপালের পূর্ব্ব সীমায় ও সিকিমের উত্তর পশ্চিম সীমায় অবস্থিত।

দার্জ্জিলিঙ্গের উত্তরে সিকিম রাজ্য। বড়রঙ্গীত, ত্রিস্রোতা বা তিস্তা এবং রম্মে নামক তিনটি নদী দার্জ্জিলিংকে সিকিম রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিতেছে। দার্জ্জিলিঙ্গের দক্ষিণে পূর্ণিয়া ও রঙ্গপুর; কিঞ্চিৎ দক্ষিণপূর্ব্বে রাজসাহী ও কুচবিহার। পূর্ব্বদিকে ডেচি ও নেচি নামক দুইটী নদী ইহাকে ভূটান হইতে পৃথক্ করিতেছে। পশ্চিমে মেচি নামক নদী ও একটী পর্ব্বত শ্রেণী ইহাকে নেপাল হইতে পৃথক্ করিতেছে। দার্জ্জিলিঙ্গের সাধারণ উচ্চতা ৭০০০ ফিট,

উচ্চতা বশতঃই ইহার এত শৈত্য। কলিকাতায় যখন দারুণ গ্রীষ্ম, দার্জ্জিলিঙ্গে তখনও বেশ শীত বোধ হয়।

পূর্ব্বে দার্জ্জিলিং সিকিমের অন্তর্ভূত ছিল। এককালে নেপালী গুরুখাগণ সিকিমের কিয়দংশ অধিকার করিয়া ক্রমে ব্রিটিষ রাজ্য আক্রমণ করে। ইংরাজগণ ইহাদিগকে পরাজিত করিয়া হিমালয় প্রদেশের কিয়দংশ ইহাদিগের নিকট হইতে গ্রহণ পূর্ব্বক নৈনিতাল, মশুরি এবং সিমলা প্রভৃতি স্থান স্বাস্থ্যবিহার স্থানরূপে ব্যবহার করিতে লাগিলেন; এবং মোরাঙ্গ নামক বর্ত্তমান দার্জ্জিলিং প্রদেশের দক্ষিণ ভাগ সিকিমপতিকে প্রদান করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। ইহার এগার বৎসর পরে দুইজন ইংরাজ কর্ম্মচারী নেপাল ও সিকিম রাজ্যদ্বয়ের সীমা নির্দ্ধারণ করিতে যাইয়া দার্জ্জিলিঙ্গের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে চৌচাঙ্গ নামক স্থান পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া আইসেন। দার্জ্জিলিং দেখিয়া তাঁহাদের মনে হইল যে এই স্থান স্বাস্থ্যোন্নতির সম্পূর্ণ উপযোগী হইবে, অতএব এই স্থানে ইংরাজ উপনিবেশ স্থাপন করিলেই ভাল হয়। তাঁহারা প্রত্যাবর্তন পূর্ব্বক তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ককে আপনাদের মন্তব্য জ্ঞাপন করিলেন। ১৮৩০ খৃঃঅব্দে জনৈক ইংরাজ আমিন সিকিম রাজ্য পরিদর্শন করিতে প্রেরিত হইলেন। তাঁহার রিপোর্ট ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরদিগের নিকট প্রেরিত হইল; ডিরেক্টরদিগের অনুমত্যনুসারে ব্রিটিষ গবর্ণমেন্ট সিকিমরাজের নিকট হইতে দার্জ্জিলিং প্রদেশ স্বাস্থ্য বিধায়ক স্থান এবং সেনানিবেশরূপে ব্যবহার করিবার জন্য চাহিয়া লইলেন; এবং তদ্বিনিময়ে সিকিমপতিকে বার্ষিক ৩০০০৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কাচমূল্যে মণি বিক্রিত হইল! এপ্রিল হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত স্বাস্থ্য লাভার্থ এবং আমোদার্থ অনেকানেক ইংরাজপুরুষ ও রমণী এস্থানে সমাগত হন। বঙ্গের শাসনকর্তা অর্থাৎ ছোটলাট বাহাদুর গ্রীষ্মকালে এই স্থানে বিহার করেন। দার্জ্জিলিং সহরের নিকটে এবং দূরে প্রায় তিন পার্শ্বেই অসংখ্য চা-বাগান। এক একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ে এক একটী বাগান এবং চা-করের সুদৃশ্য বাড়ী, আর তাহারই কিয়দ্দূরে কুলিদিগের বস্তি অথবা কুটীরময় ক্ষুদ্র গ্রাম। দার্জ্জিলিঙ্গে দাঁড়াইয়া এই চা-বাগানগুলির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে কুলি গ্রামের এক একখানি কুটীর খোলা ঘরের এক একখানি খোলার ন্যায় দেখায়। চাকরদিগের যেমন পশার, তেমনই আবার সুখ। দুঃখী বাঙ্গালীরা অর্থাভাবে এমন সুন্দর স্থান দর্শন করিয়া নয়ন মনের তৃপ্তি সম্পাদন করিতে পারেন না, আর যাঁহাদের অর্থের স্বচ্ছলতা আছে, তাঁহাদের অনেকের রুচি অন্যরূপ।

আমরা অপরাহ্ণে ২-২০ মিনিটের সময় কলিকাতা ত্যাগ করি। রেলওয়ে পথের কথা কিছুই বলিবার নাই। রেল পথের সুখ দুঃখ সকলেই জানেন। যে পথ দিয়া আমরা দার্জ্জিলিং গিয়াছি, তাহার অর্দ্ধাধিক পথ সচরাচর সকলেই গিয়া থাকেন। তবে পথে আমাদের একটী দৃশ্য বড়ই সুন্দর লাগিয়াছিল, এখনও তাহা ভুলিতে পারি নাই; সেই জন্যই একবার তাহার উল্লেখ করিতেছি। আমি পূর্ব্বে দামুকদিয়া ষ্টেসনে অনেকবার নামিয়াছি, কিন্তু একবারও দামুকদিয়াতে কোনদিকে চক্ষু আকৃষ্ট হয় নাই; কোন মতে গাড়ী হইতে নামিয়া তাড়াতাড়ি জাহাজে উঠিয়াছি। যখন পদ্মা জলে পরিপূর্ণ থাকে, তখন গাড়ী ষ্টেসনের নিকটে থামে; কিন্তু যে সময় নদীর জল কমিয়া নদীপার্শ্ব অনেক দূর পর্য্যন্ত শুকাইয়া যায়, তখন সেই শুষ্ক বালুকাময় ভূমির উপরে রেল পাতিয়া দেওয়া হয় এবং তাহার উপর দিয়া গাড়ী জাহাজ ঘাটের নিকটে আইসে। এবার রেলের দুই পার্শ্বস্থ বালুকারাশি জ্যোৎস্নালোকে এমন সুন্দর দেখাইতেছিল যে আমরা দেখিয়া দেখিয়া আর চক্ষু ফিরাইতে পারি নাই - ; ঠিক বোধ হইতেছিল যেন আমরা শুভ্রফেণ অচঞ্চল জলরাশির মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতেছি। আপনারা কোন দিন চন্দ্রালোকে বালুকার উপর দিয়া যদি যান, তাহা হইলে উহা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিবেন। জাহাজে নদীপার হইয়া আমরা সারাঘাটে আসিলাম। এখানে আসিয়া দেখিলাম গাড়ীগুলি বড় ছোট। পর দিন প্রত্যূষে আমার পূর্ব্বপরিচিত জলপাইগুড়ি পৌছিলাম। এখান হইতে একঘন্টা পরে শিলিগুড়ি আসিলাম। শিলিগুড়ি আসিয়া গাড়ী পরিবর্ত্তন করিতে হয়। শিলিগুড়ি হইতে যে ট্রেণ দার্জ্জিলিঙ্গ যায়, তাহার গাড়ীগুলি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। শিলিগুড়ি হইতে যাইতে যাইতেই মনে হইতে লাগিল, যেন ক্রমে ক্রমে উচ্চে উঠিতেছি। আর কিয়দ্দূরে আসিবামাত্রই পর্ব্বতশ্রেণী তরঙ্গায়িত দিগন্ত প্রসারিণী মেঘমালার মত সম্মুখস্থ হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে গাড়ী উচ্চতর ভুমিতে আরোহণ করিতে লাগিল; ক্রমেই মেঘায়মান পর্ব্বতদেহ স্পষ্টতর হইয়া আসিল। অতঃপর পর্ব্বত দেহস্থ বৃক্ষরাজি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুল্মের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। এদিকে রেলপথের এক পার্শ্ব নিম্নতর এবং অপর পার্শ্ব প্রাচীরের ন্যায় কিম্বা তদপেক্ষা অধিক উচ্চতর বোধ হইতে লাগিল। অবশেষে দেখি সম্মুখে ও পার্শ্বে পাহাড়ের পর পাহাড়! একবার যে স্থান অতি উচ্চ বলিয়া মনে হইয়াছে, দণ্ড দুই পরে সে স্থান কত নিম্নে পড়িয়া রহিতেছে। পার্ব্বত্য পথগুলি বক্রাকার, সেই পথে গাড়ীগুলি একবার দক্ষিণে একবার বামে বৃত্তার্দ্ধের মত বাঁকিয়া চলিতেছিল। কখন বা যে পথ দিয়া একবার চলিয়া আসিয়াছি, ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবার সেই পথেরই পার্শ্বস্থ উন্নত ভূমির উপর দিয়া আসিতেছি, কখন বা দশ পাঁচ মিনিট পরে ঠিক সেই পথের উপরিস্থ সেতু দিয়া আসিতেছি। পার্ব্বত্যপথ ও গাড়ীর গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে একটি কথা মনে হইল; ইহা আমি কোথাও পড়িয়াছি, কি ইহা আমার নিজের মানসপ্রসূত চিন্তা, তাহা ঠিক্ বলিতে পারি না। কিন্তু তখন আপনা আপনি মনে হইল যে এই পথের সঙ্গে আমাদের জীবন পথের কত সৌসাদৃশ্য, উভয়েরই উদ্দেশ্য ক্রমোন্নতি লাভ। উন্নত লক্ষ্য গুলি কত নিকট এবং সহজ প্রাপ্য বলিয়া বোধ হয়, অথচ উহার নিকট যাইবার পথ কত দীর্ঘ, যাইতে কত বিলম্ব হয়। যাঁহারা উন্নততর প্রদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, নিজের ও তাঁহাদের মধ্যস্থ দূরত্ব কত অল্প বোধ হয় অথচ নিকটস্থ হইতে কত সময় ও কত আয়াসের প্রয়োজন!

ক্রমশঃ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার - ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থাগার

[অত্রতে কিছু কিছু বাংলা বানান টাইপের অসুবিধাটুকু বাদ দিলে মূল বানান ও বিন্যাস অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। - সম্পাদক]

কেমন লাগল : - select -

Like Sign Up to see what your friends like.

tell a Friend

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনি - হিমালয়ের ডায়েরি (দ্বিতীয় পর্ব)

প্রথম পর্ব - হেমকুণ্ডের পথে

ফুলের দেশে কিছুক্ষণ

সুবীর কুমার রায়

নন্দন কানন (ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স)-এর আরও ছবি

হেমকুণ্ড যাবার পথে যে চায়ের দোকানটা দেখে গেছিলাম, সেখানেই আবার ফিরে এলাম আমরা। তীরথের মা আর বোনও ইতিমধ্যে কাণ্ডিতে পৌঁছে গেছেন। তীরথ পকোড়া, পাঁপড় ভাজা আর চা খাওয়াল। চা খেতে খেতে হঠাৎ সে একটা অদ্ভুত প্রস্তাবও করে বসল - আজই নন্দন কানন ঘুরে আসতে চায়। ওর অফিসের ছুটি খুব কম। মা, ভগ্নীপতি আর বোনকে নিয়ে বদ্রীনারায়ণ যাবে, গরম কুণ্ডে স্নান করে পুণ্য অর্জন করতে। তাই আজ না গেলে ওর আর ওখানে যাওয়াই হবেনা।

আমার মনেও এ ইচ্ছা অনেকক্ষণ থেকেই উঁকি দিচ্ছিল। তীরথের প্রস্তাব শুনে বললাম, নন্দন কাননের কিছু ছবি তোলার ইচ্ছা আছে। আকাশের অবস্থা মোটেই ভাল নয়, সন্ধ্যাও নেমে আসবে। আজ ওখানে যাওয়া যেতেই পারে, যদি ভাল আবহাওয়া না পাই, তবে আগামীকাল সকালে আবার যাব। আকাশ নিশ্চয় পরিষ্কার হবে, অন্তত ভালভাবে দেখবার ও ছবি তুলবার মতো পরিষ্কার হবে, এই আশা নিয়ে চটপট বেরিয়ে পড়লাম। যে জায়গাটা থেকে রাস্তা দু'দিকে ভাগ হয়ে গেছে, সেখানে পৌঁছে দিলীপ বলল ও আজ আর হাঁটতে পারবে না। আমাদের পক্ষেও যে কতটা সম্ভব জানিনা তাও উৎসাহ নিয়ে বললাম, আজ তীরথকে নন্দন কানন দেখিয়ে নিয়ে আসি। কাল ওকে বদ্রীনারায়ণ পাঠিয়ে দিলে আমরা মুক্ত। কাল সকালে আমরা তিনজন আবার নন্দন কানন যাব। দিলীপের হাতে ফুলের ব্যাগ আর কাপড়ের ব্যাগদুটো দিয়ে, ওয়াটারপ্রুফ হাতে নিয়ে, আমরা নন্দন কাননের রাস্তা ধরলাম। ওরা নীচে গুরুদ্বোয়ারার উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।

খানিক এগোতে না এগোতেই বৃষ্টি শুরু হ'ল। গায়ে ওয়াটারপ্রুফটা চাপিয়ে নিলাম। রোদের থেকে মাথা বাঁচানোর জন্য একটা কাপড়ের টুপি পড়াই ছিল, তার ওপরে বর্ষাতির টুপিটা দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে ভিজে যাচ্ছে দেখে মাথায় হাত দিয়ে দেখি, হায় কপাল সেটা কখন আমায় ত্যাগ করে চলে গেছে! মহা চিন্তায় পড়লাম। এভাবে পথ চলা অসম্ভব। ভবিষ্যতেই বা কী করবো? তীরথকে ডেকে বিপদের কথা বললাম। ও এখন ভগ্নীপতি ছাড়া হয়ে, এবং আজই নন্দন কানন দেখার সুযোগ পেয়ে, আনন্দে তিনগুণ গতিতে চলেছে। পাহাড়ি রাস্তায় কত জোরে যে হাঁটতে পারে, এতক্ষণে বেশ বুঝতে পারছি। তীরথ বলল, ওর টুপিটা আমি নিতে পারি, বর্ষাতির সঙ্গে আটকানো আর একটা টুপি আছে। বললাম, কিন্তু এরপর? বলল, দুটো বর্ষাতি টুপির কোন প্রয়োজন নেই, কাজেই এই টুপিটা আমি স্বচ্ছন্দে নিজের কাছেই রাখতে পারি। মুশকিল হল ওর টুপির মাপ অনেক বড়, আমার চোখ ঢেকে যাচ্ছিল। কোন রকমে চারপাশে মুড়ে, ছাই রঙের বর্ষাতির সঙ্গে গোলাপী রঙের টুপি পরে, এগোতে শুরু করলাম। সামনে একটা গ্লেসিয়ার পড়লো। একটা মাঠের মতো পাথুরে অংশের ওপর দিয়ে গিয়ে গ্লেসিয়ারটা পার হতে হবে। সাবধানে চলেছি। দেখি কতগুলো ছেলে গ্লেসিয়ার কেটে রাস্তার মতো তৈরি করছে। ওরা তীরথের কাছে কিছু সাহায্য চাইল। ও খুচরো পয়সা বার করে, তাদের দিয়ে এগিয়ে গেল।

নন্দন কাননে তীরথ ও আমি

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, তীরথ যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, সেখানকার গ্লেসিয়ারটা কীরকম ঝুলছে। গ্লেসিয়ারের ওই অংশের বরফ গলে গিয়ে একটা পাতলা বরফের তক্তার মতো হয়ে রয়েছে। তক্তার শেষ দিকটা আরও পাতলা হয়ে বিপজ্জনক অবস্থায় ঝুলছে, আর তীরথ ঠিক সেই পাতলা বরফের তক্তাটার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। তক্তার অনেক নীচ দিয়ে তীব্র বেগে জল বয়ে যাচ্ছে। যে কোন মুহূর্তে বরফের তক্তাটা ভেঙ্গে গিয়ে তীরথকে নিয়ে অনেক নীচের জলপ্রবাহে পড়তে পারে। ভয়ার্ত গলায় চিৎকার করে ওর নাম ধরে নীচ থেকে ডাকলাম। ও বোধহয় ইশারা বুঝতে পেরে লাফ দিয়ে অনেকটা বাঁপাশে সরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কাছে যেতেই আমাকে প্রাণ বাঁচানোর, অন্তত পক্ষে চরম বিপদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য, বারবার ধন্যবাদ জানিয়ে দু'হাত ভরে মনাক্কা, কিশমিশ ইত্যাদি দিয়ে আমাদের সঙ্গে এগিয়ে চললো।

ক্রমশঃ ওর থেকে আমাদের ব্যবধান আবার বাড়তে লাগল। সকাল থেকে শুধু কয়েক কাপ চা এবং তীরথের মনাক্কা, কিশমিশ, পেস্তা, ছোট এলাচ খেয়ে রয়েছি। নিশ্বাস নিতে খুব কষ্ট হচ্ছে, বোধহয় দম ফুরিয়ে এসেছে। মাধব আমার থেকে কিছুটা এগিয়ে, তীরথকে বহুদূরে দেখা যাচ্ছে। কিছুটা এগিয়ে দেখি তীরথ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে, আবার একসঙ্গে হলাম। একটি ছেলে নন্দন কানন থেকে ফিরছিল। সে আমাদের সাবধান করে বলল, রাস্তা খুব খারাপ, বৃষ্টি হচ্ছে, আর এগোলে ফিরতে অসুবিধা হবে। তীরথ একটু মনখারাপ করেই জিজ্ঞাসা করল কী করা উচিত? এতটা পথ কষ্ট করে এসে ফিরে যাওয়া চলে না, যা আছে কপালে হবে - মাধব কিছু বলার আগেই আমি উত্তর দিলাম। ওরা রাজি হল। পথে এবার দ্বিতীয় একটা গ্লেসিয়ার পড়ল। সাবধানে পার হয়ে রাস্তায় উঠলাম। এ পথে কাণ্ডি বোধহয় যায় না, তবে ঘোড়া বা খচ্চরের যাতায়াত আছে বোঝা যাচ্ছে। রাস্তা বলতে অভ্রযুক্ত পাথরের টুকরো ইতস্তত ভাবে ফেলা রয়েছে। অসম্ভব ধারালো পাথর, খালি পায়ে হাঁটলে, পা কেটে যাবেই। বৃষ্টির জল ও ঘোড়ার নাদে রাস্তা আরও পিছল হয়ে আছে। দূরে চোখে পড়ল সবুজ বন।

একটা ব্রীজ পার হয়ে আবার তীরথকে ধরতে পারলাম। বিরাট এলাকা নিয়ে এই ফুলরাজ্য। এখান থেকে ঘাংঘারিয়ার দূরত্ব প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার। তবে ভালভাবে নন্দন কাননকে দেখতে হলে আরও দেড়-দু' কিলোমিটার পথ এগোতে হবে। এক হাত থেকে এক বুক পর্যন্ত ফার্ণ জাতীয় গাছের মধ্যে দিয়ে পায়ে হেঁটে ঘুরতে হবে। দূর থেকে দেখলে শুধুই সবুজ বন বলে মনে হয়। দু'হাত দিয়ে জঙ্গল সরিয়ে বনের মধ্যে না ঢুকলে, ফুল পাওয়া যাবে না। বেশিরভাগ ফুলের আকারও খুব ছোট ছোট। বইয়ে পড়েছিলাম, এখানে জোঁকের উপদ্রব খুব বেশি। একটা সরু ঝরনার মতো ধারার জল খেয়ে বনের মধ্যে প্রবেশ করলাম। বুঝতেই পারছি জামা প্যান্ট সব ভিজে যাবে। বর্ষাতি গায়ে থাকায় অবশ্য শুধুই প্যান্ট ভিজতে শুরু করলো। এক এক রঙের ফুল, এক এক জায়গায় ফুটে আছে। কী তাদের রঙ। মনে হয় যেন ফুলের রঙ অনুযায়ী ফুলের গাছ বিভিন্ন জায়গায় লাগানো হয়েছে। মাইকের চোং-এর মতো দেখতে একরকম ফুল দেখলাম। যত রঙ, যত কারুকার্য, সব ফুলের ভিতরের অংশে, ফুলের বাইরেটা বিশ্রী ফ্যাকাশে সবুজ রঙের। চারিদিকে একরকম হলুদ ও সাদা রঙের ফুলের ঝাড় চোখে পড়ছে। রজনীগন্ধার মতো বড় বড় ডাঁটার ওপর থোকা থোকা ফুল, অনেকটা এলাকাকে হলুদ বা সাদা করে, সব গাছের ওপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। উপত্যকার চারিদিকের পাহাড়ের ওপরেও সবুজ বনের রাজত্ব। ওখানেও হয়তো এইসব ফুল পাওয়া যাবে, হয়তো এর থেকেও সুন্দর ফুলেরা লোকচক্ষুর আড়ালে ওখানেই বসবাস করে। তীরথ তার মা ও বোনকে দেখাবার জন্য হেমকুণ্ড সাহেবে দেখেনি এমনসব ফুল তুলে সংগ্রহ করতে শুরু করল। এখানে কিন্তু ব্রহ্মকমল পাওয়া যায় না। বিস্তীর্ণ এলাকা ঘুরেও, আমাদের অন্তত একটাও চোখে পড়ে নি। সম্ভবত এখানকার উচ্চতা হেমকুণ্ডের তুলনায় অনেক কম বলে, এখানে এ ফুল ফোটে না। হেমকুণ্ডে একরকম বেগুনি রঙের দোপাটির মতো ফুল দেখেছিলাম, এখানে সেই ফুল অজস্র ফুটে আছে, তবে সব হলুদ রঙের। এবার বর্ষা অনেক দেরিতে এসেছে, এখনও ভাল করে আসেনি বললেই ঠিক হবে। তাই সব ফুল এখনও ফোটেনি। অদ্ভুত অদ্ভুত সব ফুলের কুঁড়ি হয়ে আছে। ফুলের বন দিয়েই যাত্রীরা ঘুরে বেড়ায়, ফলে অনেক গাছ কাত হয়ে মাটিতে শুয়ে আছে। বৃষ্টিতে ভিজে এত কষ্ট করে

এতটা পথ হেঁটেও খুব একটা নতুন ফুল দেখতে না পেয়ে মনটা বেশ খারাপ। ঠিক করলাম কাল আর আসব না। দিলীপ হয়তো আমাদের কথা বিশ্বাস করবে না। তীরথকে বললাম, ওকে একটু বুঝিয়ে বলতে। এবার বেশ জোরেই বৃষ্টি নামল। দ্রুত পা চালালাম। বৃষ্টির তোড়ে নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। একে বৃষ্টি, তার ওপর ভীষণ জোরে হাওয়া বইছে। বৃষ্টির ছাটে ভাল করে তাকানো পর্যন্ত যাচ্ছে না। তিনজনে লাইন দিয়ে হেঁটে বন পেরিয়ে রাস্তায় উঠলাম। এই অবস্থাতেও তীরথ ওর মা ও বোনের জন্য নতুন ফুলের অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে। আমরাও ওর কাজে সাহায্য করতে করতে পথ চলছি। রাস্তায় সেই ছেলেটা ছাড়া আর কাউকে এতক্ষণ পর্যন্ত চোখে পড়েনি। আমরা তিনজনেই এত বড় ফুলের সাম্রাজ্যে বিচরণ করছি। রাস্তা বেশ পিচ্ছিল হয়ে গেছে। টুকরো টুকরো পাথরগুলো ফেলে যেন আরও বিপদ সৃষ্টি করেছে। যতটা সম্ভব মুখ ঢেকে, প্রায় ছুটে আমরা নীচে নেমে আসছি। গ্লেসিয়ারগুলো একে একে লাঠি ঠুকে ঠুকে অতিক্রম করে এলাম। বর্ষাতি আমাদের বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা করতে পারছে না। আমরা পায় সম্পূর্ণ স্নান করে গেছি। অবশেষে একসময় কষ্টের সমাপ্তি ঘটিয়ে ছুটে গুরুদ্বোয়ারার হলঘরে ঢুকলাম।

তীরথের মা, বোন, দিলীপ - সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে বলে মনে হল। বাইরে প্রবল বৃষ্টি, হলঘরের ভিতরে মোটা মোটা কম্বল গায়ে দিয়ে ওরা আরামে শুয়ে আছে। এদিকে আমরা বৃষ্টিতে সর্বাঙ্গ ভিজিয়ে ঠাণ্ডায় কাঁপছি। আমাদের দু'জনের আবার ওই অবস্থায় থাকা ছাড়া উপায়ও নেই। সঙ্গে কোন দ্বিতীয় পোশাক নেই। দিলীপকে ডেকে সব বললাম। আগামীকাল আর ওখানে যাবার কোন যুক্তি নেই, তাও জানালাম। আমি আর মাধব বাইরের চায়ের দোকানে এসে, আলুর পরোটা আর কফি খেলাম। দোকানের একটা ছেলেকে দিয়ে তীরথদের জন্যও পাঠালাম। একটু পরে দিলীপ দোকানে এল। দোকানদার জানতে চাইলেন, আমরা আজ নন্দন কানন গিয়েছিলাম কীনা। খানিক হতাশার সুরেই বললাম গিয়েছিলাম, তবে ফুল সেরকম পেলাম না - আমাদের জায়গাটা খুব একটা ভাল লাগেনি। দোকানের বাইরের দিকে এক ভদ্রলোক বসে চা খাচ্ছিলেন। শুনে বললেন, নন্দন কানন যেতে একটা নদী পার হতে হয়। ওই নদীর কাছে একটা গ্লেসিয়ার ভেঙ্গে গেছে। ভাঙ্গা গ্লেসিয়ারের ওপারে অনেক ফুল আছে। উনি ভাঙ্গা গ্লেসিয়ার পার হয়ে ওপারে যেতে সাহস করেন নি। তবে একজন ভদ্রলোক ওপারে গিয়েছিলেন, তাঁর কাছে শুনেছেন। দোকানদার এবার জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা কবরখানা পর্যন্ত গিয়েছিলাম কীনা। কথাটা শুনে মন খারাপ হয়ে গেল। অনেক দিন আগে একটা বইতে নন্দন কাননের কবর সম্বন্ধে পড়েছিলাম। যাঁর কবর, সেই জোয়ান মার্গারেট লেগি সম্বন্ধেও অনেক কিছু পড়েছিলাম। উনি নাকি ইংল্যান্ড থেকে ফুলের বীজ সংগ্রহ করতে এসে দুর্ঘটনায় এখানে মারা যান। ঠিক করে এসেছিলাম, কবরটা দেখতে যাব, ফুল দেব, ছবি তুলব। আর কার্যক্ষেত্রে একবারে ভুলেই গেলাম! আসলে বৃষ্টি আর রাস্তার কষ্ট, আমাদের সব গোলমাল করে দিয়েছে। দোকানদার এবার বললেন, ওই কবরখানার কাছেই আসল ফুল পাবেন, আপনারা নন্দন কাননের আসল জায়গাটাই যাননি। দ্বিতীয় গ্লেসিয়ার থেকে নন্দন কাননের এলাকা শুরু হলেও, যত ভিতরে যাবেন, তত নতুন নতুন ও সুন্দর ফুলের সন্ধান পাবেন। এরপরেও সেখানে না গিয়ে ফিরে যাই কী করে? বন্ধুদের বললাম, কাল ভোরে এই দোকান থেকে পরটা, ডিমসিদ্ধ কিনে নিয়ে, আমরা আবার নন্দন কানন যাব। তীরথকে বলব ও যেন গোবিন্দঘাট চলে যায়, সম্ভব হলে বদ্রীনারায়ণ। আমরা নন্দন কানন থেকে সোজা গোবিন্দ ঘাট, সম্ভব হলে বদ্রীনারায়ণ চলে যাব। গুরুদ্বোয়ারার হলঘরে ফিরে এসে কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে পরলাম। তীরথকে আমাদের প্ল্যান জানালাম। ঠিক হল আগামীকাল বিকেলে গোবিন্দঘাটে আবার আমাদের দেখা হবে।

বিশ-এ আগষ্ট। আজ আমরা তিনজন নন্দন কানন যাব। রাস্তা আমাদের চেনা হয়ে গেছে, অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। তীরথরা তৈরি, তৈরি আমরাও। তবে ওদের পথ গুরুদ্বোয়ারা থেকে বেরিয়ে ডানদিকে, আর আমরা যাব বাঁদিকে। ওরা যাবে গোবিন্দঘাট, আমরা নন্দন কানন। হাঁটতে হাঁটতে একসময় আমরা দ্বিতীয় গ্লেসিয়ারটার কাছে পৌঁছলাম। আকাশ একেবারে পরিষ্কার, সুন্দর রোদ উঠেছে। এখনও সেই ভদ্রলোকের কাছে শোনা - নদী ও ভাঙ্গা গ্লেসিয়ারের কথা মনে ঘুরপাক খাচ্ছে। আস্তে আস্তে একসময়, গতকাল যেখান থেকে প্রথম ফার্ণ জাতীয় গাছের বনে ঢুকেছিলাম, ব্রীজ পার হয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হলাম। আজ আর বর্ষাতি গায়ে নেই, ফলে প্যান্টের সাথে জামা ও সোয়েটারও ভিজেছে। সামনে বিরাট অঞ্চল জুড়ে বেগুনি ও হলুদ রঙের দোপাটির মতো একপ্রকার ফুলের জঙ্গল। দেখলে মনে হবে কেউ চাষ করেছে, কারণ এখানে এ ছাড়া অন্য কোন ফুল নেই। অনেকটা অঞ্চল জুড়ে, যেন একটা বড় মাঠে, এই ফুলের চাষ করা হয়েছে। দিলীপকে বললাম ফুলের জঙ্গলের মাঝখানে দাঁড়াতে, উদ্দেশ্য একটা ছবি তোলা। একটা বড় পাথর পড়ে আছে। তার ওপরে উঠে ছবি নেব বলে প্যান্টটা যেই একটু তুলেছি, ব্যাস হাঁটু পর্যন্ত বিছুটি লেগে গেল। চুলকাতে চুলকাতে প্রাণ যায় আর কী! ছবি তুলে আবার এগিয়ে চললাম। গতকালের জায়গাটা পেরিয়ে প্রায় মাইল খানেক যাওয়ার পর চোখে পড়ল, ভাঙ্গা গ্লেসিয়ারটা। ভাঙ্গা বললে ভুল হবে। আসলে একটাই গ্লেসিয়ার ওপর থেকে নীচে নেমে এসেছে। কিন্তু মাঝখান থেকে দু'ভাগে বিভক্ত। মাঝখানটা দিয়ে একটা দশ-বার ফুট চওড়া নদী, প্রবল বেগে গড়িয়ে নেমে আসছে। কিছুটা এগিয়েই নদীটা আবার গ্লেসিয়ারের ভিতর ঢুকে যাচ্ছে। ঐ জায়গাটা কিরকম গর্ত মতো। যেন গ্লেসিয়ারটা নদীটাকে গ্রাস করবার জন্যই বিশাল হাঁ করে আছে। ওখানে পড়লে গ্লেসিয়ারের ভিতর দিয়ে কোন রাজ্যে নিয়ে যাবে জানি না। কবরের কাছে যেতে হলে, নদীটার অপর পারে যেতে হবে।

নদীর ওপর ছোট বড় অনেক পাথর পড়ে আছে। কোনটা জলের তলায়, কোনটা বা মাথা বার করে আছে। জলের গভীরতা না থাকলেও, গতি খুব বেশি। পাথরে পাথরে ধাক্কা খেয়ে, জলের রঙ দুধের মতো সাদা দেখাচ্ছে। দিলীপ ও মাধবকে বললাম, জুতো খুলে ফেলতে। আমি আগে নদী পার হয়ে গিয়ে, ওদের হাত থেকে মালপত্র নিয়ে নেব। তারপরে ওরা একে একে, আমার বাড়ানো লাঠি ধরে পাথরের ওপর দিয়ে পা ফেলে নদী পার হয়ে যাবে। এই ব্যবস্থা পাকা করে, পাথরের ওপর লাফ দিয়ে দিয়ে নদী পার হয়ে, অপর পারে গিয়ে দাঁড়ালাম। অদ্ভুত ব্যাপার, নদীর এপারটা আবার পুরো বরফে আচ্ছাদিত, খালি পায়ে দাঁড়াতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। মাধবকে বললাম একটা একটা করে জুতোগুলো ছুঁড়ে দিতে। মাত্র দশ-বার ফুট দূর থেকে ওগুলো আমি সহজেই লুফে নিতে পারবো। মাধবের কিন্তু অন্য মত। সে বললো, লোফালুফিতে যথেষ্ট ঝুঁকি আছে। ঠিকমতো লুফতে না পারলে, নদীতে পড়ে যেতে পারে। আর একবার নদীতে পড়লে, গ্লেসিয়ারের সেই

হাঁ করা গর্ত দিয়ে গ্লেসিয়ারের ভিতর চলে যাবে। তাই ও ঠিক করলো একটা একটা করে জুতো, ও আমার দিকের পারে, বরফের ওপর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। সেইমতো ও ওপার থেকে প্রথম পাটি জুতোটা দক্ষ ক্রিকেটারের স্টাইলে এপারে ছুঁড়লো, এবং আমরা চরম বিপদের মধ্যে পড়লাম। হান্টার সু-এর পিছন দিকটা সামনের দিকের তুলনায় অনেক বেশি ভারী। ও জুতোর ফিতে ধরে জুতোটা এপারে বেশ জোরে ছোঁড়ায়, ওটা এপারে না এসে, সোজা ওপরদিকে অনেকটা উঠে গেল। আমি এক পা নদীতে বাড়িয়ে কোনমতে ওটাকে লুফে নেবার চেষ্টা করলাম। ক্রিকেট খেলায় ওভার বাউন্ডারি মারতে গিয়ে যেমন মাঝেমাঝে, বল মাঠের বাইরে না পড়ে অনেক ওপরে উঠে মাঝমাঠে পড়ে, ঠিক সেই রকম ভাবে আমার প্রায় হাত খানেক দূর দিয়ে অনেকটা ওপর থেকে ওটা নদীতে গিয়ে পড়লো, এবং সঙ্গে সঙ্গে নদীর প্রবল স্রোতে, নীচের দিকে বরফের গহ্বরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো। পা দিয়ে ওটাকে কোনমতে অপর পারে কিক্ করে পাঠাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু চোখের নিমেষে সেটা আমার পায়ের পাতার ওপর দিয়ে চলে গেল। নদীর ওপারে, যেখানে দিলীপ দাঁড়িয়ে, সেখানে ওটাকে এক মুহূর্তের জন্য দেখা গেল। চিৎকার করে ওকে লাঠি দিয়ে ওটাকে আটকাতে বললাম। কিন্তু ও দেখতে পাবার আগেই, সেটা আবার জলের তলায় চলে গেল। বুকের মধ্যে যেন কেমন করে উঠলো। টাকা পড়ে গেলে তবু টাকার যোগাড় করা যাবে, অন্তত ফিরে আসা যাবে। কিন্তু জুতো? জুতো কোথায় পাব? তিন-তিনটে গ্লেসিয়ার পেড়িয়ে, জোঁক ও বিছুটি বনের মধ্যে দিয়ে হেঁটে গিয়ে , অভ্রযুক্ত ধারালো পাথরের ওপর দিয়ে পাঁচ কিলোমিটার পথ খালিপায়ে বা একপায়ে জুতো পড়ে হাঁটলে, তবে ঘাংঘারিয়া। সেখানে কোন দোকান নেই। ওখান থেকে তের-চোদ্দ কিলোমিটার পথ হাঁটলে, গোবিন্দঘাট। এ পথটাও উঁচুনীচু অসমান পাথুরে পথ। ওখানে চায়ের দোকান কয়েকটা আছে বটে, কিন্তু জুতোর দোকান কোথায়? ওখান থেকে বাসে পঁচিশ কিলোমিটার রাস্তা গিয়ে বদ্রীনারায়ণ। ওখানে বদ্রীবিশালের কৃপায়, জুতো হয়তো কিনতে পাওয়া যাবে, তবে ভাল নরম জুতো পাওয়া যাবে কী না, বা পায়ের মাপে পাওয়া যাবে কী না, যথেষ্ট সন্দেহ আছে। নন্দন কাননের রাস্তা ঘোড়ার নাদে ভর্তি। এপথে খালিপায়ে হাঁটতে গেলে ধারালো পাথরে পা কাটবেই, আর তার ওপরে ঘোড়ার নাদের প্রলেপ? স্বর্গের রাস্তা পরিষ্কার!

হাঁ করে দাঁড়িয়ে চিন্তা করার সময় নেই। আমার দিকের পারে, একটু দূরে বরফের গহ্বরের কাছে, একটা পাঁচ-ছয় ফুট উচু প্রায় গোলাকার পাথর রয়েছে। পাথরটার পিছনে সাত-আট ফুট দূরে সেই মৃত্যু গহ্বরে নদীটা ঢুকে যাচ্ছে। দৌড়ে পাথরটার কাছে গিয়ে হাতের চাপ দিয়ে ওটার ওপরে উঠেই, দেখতে পেলাম আমাদের পরম আরাধ্য দেবতাটিকে। ফিতেটা একটা পাথরের তলায় কী ভাবে আটকে গিয়ে জলের স্রোতে বনবন্ করে ঘুরছে। যেকোন মুহূর্তে ফিতে ছিঁড়ে বা পাথর থেকে আলগা হয়ে, সঙ্গে সঙ্গে বরফের ভিতর চলে যাবে। চিৎকার করে মাধবকে ডাকলাম, উদ্দেশ্য ও এসে আমায় ধরবে। আমি নীচে নেমে ওটাকে তুলে আনবো। মাধব কী করবে ভেবে পেল না। সময়ও আর নষ্ট করা চলে না, যা করার এখনই করতে হবে। বিপদ মাথায় করে নীচে গহ্বরের কাছে বরফের ওপর লাফ দিলাম। যে গ্লেসিয়ারের ওপর একটু আগে হাঁটতে ভয় পাচ্ছিলাম, সমতল হওয়া সত্ত্বেও লাঠি দিয়ে ঠুকে ঠুকে হাঁটছিলাম, সেই গ্লেসিয়ার, তা আবার নীচের দিকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে, এবং একটু দূরেই ওরকম মৃত্যু গুহা থাকা সত্ত্বেও, অত উঁচু পাথরের ওপর থেকে কোন কিছু না ভেবে স্বচ্ছন্দে লাফ দিয়ে দিলাম। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে, জুতোটাকে দু'হাতে চেপে ধরলাম। ওঃ, সে যে কী আনন্দ পেলাম কী বলবো। আমার সামনে বড় পাথরটা, তাই মাধবরা কী করছে দেখতে পাচ্ছি না। জুতো হাতে উঠে দাঁড়ালাম। অনেকক্ষণ একভাবে খালিপায়ে বরফের ওপর লাফঝাঁপ করে, পা দুটো ঠাণ্ডায় প্রায় অবশ হয়ে গেছে। উত্তেজনায় এতক্ষণ বুঝতে পারি নি। এখন দেখছি সোজা হয়ে দাঁড়াতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। মাধবরা এখন আমায় দেখতে পাচ্ছে। ওরা দূর থেকেও আমার অবস্থার কথা বুঝে ফেলেছে। মাধব দু'হাত নেড়ে চিৎকার করে আমায় বসে পড়তে বলছে। কিন্তু বসব কোথায়? যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেটাও তো বরফ। শেষে হাতের চাপে পাথরটার ওপর উঠবার চেষ্টা করলাম। এদিক থেকে পাথরটার উচ্চতা অনেক বেশি হওয়ায়, পাথরের ওপর ওঠাও বেশ কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। শেষ পর্যন্ত হাতের চাপে বরফ থেকে পাথরটার ওপর উঠতে সমর্থ হলাম। জুতোর ওপর হাতের চাপ পড়ায়, জুতোর ভেতরের সমস্ত জল ছিটকে আমার মুখ, চোখ, সোয়েটার ভিজিয়ে দিল। একটু সময় নিয়ে আবার আগের জায়গায়, মানে নদীর পারে ফিরে এলাম। এতকিছু ঘটনা ঘটতে বোধহয় পাঁচ মিনিটও সময় নিল না। মাধবকে বললাম আস্তে আস্তে বাকী জুতোগুলো ছুঁড়ে আমার হাতে দিতে। একটা একটা করে সবগুলো জুতো আমার পায়ের কাছে জড়ো করলাম। লাঠিতে ঝুলিয়ে ক্যামেরাটাও এপারে নিয়ে আসলাম। এবার এপার থেকে একটু জলে নেমে লাঠিটা বাড়িয়ে ধরলাম। ওরা লাঠি ধরে সহজেই এপারে চলে এল। জুতোটা জলে ভিজে নতুনদার পাম্প সুতে পরিণত হয়েছে। মাধব ভিজে জুতোর ভেতর থেকে মোজা বার করে ঘোষণা করলো - "এটা দিলীপের জুতো"। দিলীপের মুখের তখন কী শোচনীয় অবস্থা। ওর পায়ের মাপ অস্বাভাবিক বড়। জুতো হারালে, কষ্ট করে বদ্রীনারায়ণ গেলেও ওর পায়ের মাপের জুতো মিলতো না। কারণ কলকাতাতেই আমাদের পায়ের মাপের হান্টার স্যু পাওয়া গেলেও, অনেক দোকানেই ওর মাপের জুতো পাওয়া যায়নি। ও আমাকে বারবার কৃতজ্ঞতা জানাতে লাগলো, আর আমি মনে মনে মাধবকে গালাগাল করতে লাগলাম। জায়গাটাকে স্মরণীয় করে রাখতে গোটাকতক ছবি নিয়ে নিলাম। এতক্ষণে বুঝছি উত্তেজনায় কী সাংঘাতিক ঝুঁকি নেওয়া হয়েছিল। জুতো পরে আবার হাঁটা শুরু হল।

এবার কিন্তু সত্যিই নতুন নতুন ফুলের সন্ধান পেলাম। সব রকম ফুল কিছু কিছু করে তুলে, দিলীপের হাতে দিলাম। উদ্দেশ্য কবরে ফুল দেব। টিপটিপ করে বৃষ্টি শুরু হ'ল। ওয়াটারপ্রুফ গায়ে চাপিয়ে, এক বুক ফার্ণ জাতীয় গাছের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছি। সাপখোপ বা জোঁকের চিন্তা একবারও মাথায় আসেনি। মধ্যে মধ্যে গাছে ঢাকা পাথরের টুকরোতে হোঁচট খাচ্ছি। এগুলো খুব বিপজ্জনকও বটে। অসাবধানে দুই পাথরের মধ্যে পা পড়লে, পা ভেঙ্গে যেতে পর্যন্ত পারে। দূরে একটা সাদা রঙের পতাকা উড়ছে। ওটাই সম্ভবত কবর। আমি ওদের থেকে অনেকটা এগিয়ে আছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা কবরের কাছে চলে এলাম। তুলে আনা সমস্ত ফুল কবরের বেদীর ওপর দিয়ে, রোদের অপেক্ষায় রইলাম। অবশেষে সে আশা ছেড়ে একটা বড় পাথরের ওপর বসে, আলুর পরোটা ও ডিম সিদ্ধর গতি করতে লাগলাম। হঠাৎ একটু শরৎকালের মতো রোদ দেখা গেল।

বেদীর ওপর একটা ছোট মার্বেল পাথরের ফলক। মাঝখান থেকে ফেটে গেছে। হাত দিয়ে ধুলো, গাছের শুকনো পাতা সরিয়ে, খুব কাছ থেকে আবার ছবি নিলাম। কবরটার পাশে, আমাদের এখানকার বনবেগুনের মতো দেখতে, অদ্ভুত নীল রঙের একরকম ফুল দেখলাম। চারদিকে আরও কিছুটা ঘুরে, ফিরবার পথ ধরলাম। সময় নষ্ট করে লাভ নেই। যদি সম্ভব হয়, আজই বদ্রীনারায়ণ চলে যাব। দু'টো জায়গা দেখা হল।

জোয়ান মার্গারেট লেগির সমাধি

এবার তৃতীয় জায়গার জন্য তৈরি হতে হবে। একসময় আমরা আবার সেই নদীটার কাছে ফিরে এলাম। কোন রাস্তা না থাকায়, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আন্দাজে হেঁটে এসে দেখি, গতবার যেখান দিয়ে নদী পার হয়েছিলাম, সেখানে না এসে অন্য জায়গায় এসে হাজির হয়েছি। লাঠি ঠুকে বরফের ওপর দিয়ে নদীতে নামলাম। ওদের দাঁড়াতে বলে কোনদিক দিয়ে পার হওয়া সুবিধাজনক ভাবছি, মাধবই আবিস্কার করলো সেই সহজতম পথটা। সুন্দরভাবে

মার্গারেটের সমাধি - এখন

পাথর পড়ে আছে। তিনজনই এবার জুতো পায়ে সহজেই নদী পার হয়ে এলাম। এপারে এক বৃদ্ধ ইংরেজ ভদ্রলোক, সঙ্গী ইংরেজ বৃদ্ধাকে নিয়ে খুব বিপদে পড়েছেন। কোনখান দিয়ে পার হলে তাঁদের সুবিধা হবে, ঠিক করতে পারছেন না। একটু দূরে এক হিন্দুস্থানি স্বামী-স্ত্রীরও সেই একই সমস্যা। সেই ইংরেজ বৃদ্ধার দিকে হাত বাড়াতে, তিনি এত জোরে আমার হাত চেপে ধরলেন, যে ভয় হল তিনি পড়লে একেবারে আমায় নিয়ে পড়বেন। একটা একটা করে পাথর টপকে এগোচ্ছি, আর তাঁকে টেনে নিয়ে আসছি। শেষ বড় পাথরটার ওপর থেকে ওপারে উঠলাম। বৃদ্ধাটি বড় পাথরটায় দাঁড়ালেন। তাঁকে একটানে এপারে নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে, সম্ভবত তাঁর পায়ের চাপে, পাথরটা গড়িয়ে জলে চলে গেল। খুব সামলানো গেছে যাহোক! ওপথে আর ওপারে ফেরা গেল না। একটু ঘুরে আবার ওপারে গেলাম। বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে যতক্ষণ দেখতে পেলাম, দেখলাম হাত নেড়ে আমাদের বিদায় জানালেন। আবার সেই ফুল, আবার সেই বনজঙ্গল, ক্রমে ভাঙ্গা রাস্তা, গ্লেসিয়ার, ঝরনা ফেলে, আমরা আবারও সেই চেনা হয়ে ওঠা চায়ের দোকানে ফিরে এলাম।

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

প্রথম পর্ব - হেমকুণ্ডের পথে

নন্দন কানন (ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স)-এর আরও ছবি

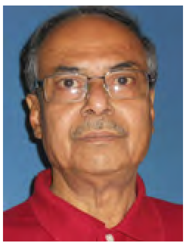

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের অবসরপ্রাপ্ত অফিসার সুবীর কুমার রায়ের নেশা ভ্রমণ ও লেখালেখি। ১৯৭৯ সালে প্রথম ট্রেকিং – হেমকুন্ড, ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স, বদ্রীনারায়ণ, মানা, বসুধারা, ত্রিযুগী নারায়ণ, কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী-গোমুখ ও যমুনোত্রী। সেখান থেকে ফিরে, প্রথম কাগজ কলম নিয়ে লিখতে বসা। ভ্রমণ কাহিনি ছাড়া গল্প, রম্য রচনা, স্মৃতিকথা নানা ধরণের লিখতে ভালো লাগলেও এই প্রথম কোন পত্রিকায় নিজের লেখা পাঠানো।

কেমন লাগল : - select -

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আমার মায়ের বাপের বাড়ির দেশে

অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়

মায়ের বাপের বাড়ি অর্থাৎ মামার বাড়ির প্রতি আকর্ষণ কার না নেই? আর সেখানে মামা-মামী, দাদু-দিদা সবাই থাকলে তো ব্যাপারটাই আলাদা। তার সঙ্গে উপরি যদি পুকুরের মাছ, বাগানের গাছের আম-কাঁঠাল, আর ক্ষীর-ছানা-চাঁচি-সন্দেশ এসবও থাকে তাহলে আর কথাই নেই! আমার পরম সৌভাগ্য যে এমন একটা জায়গাতেই আমার মামার বাড়ি। এরপরেও বাড়তি পাওনা বাড়ির কালীপুজোয় সবাই মিলে হইচই। আর হাতের কাছেই চমৎকার সব বেড়ানোর জায়গা।

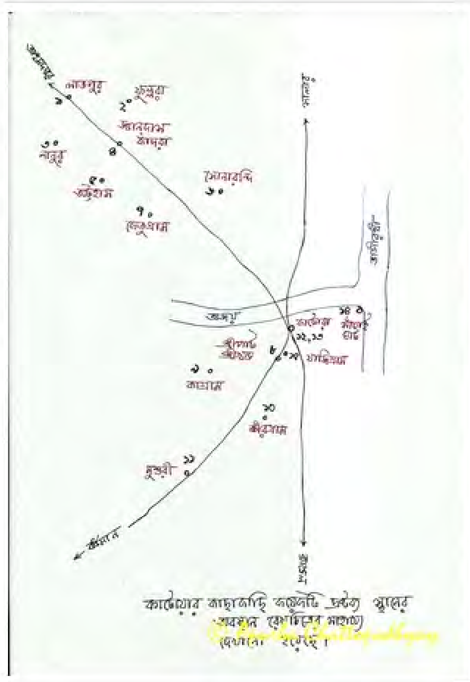

আমার মামার বাড়ির দেশ বর্ধমান জেলার উত্তর-পূর্বে কাটোয়ার কাছে - দাঁইহাট রেলস্টেশনের পাশের গ্রামে, নাম নলহাটি। গঙ্গার তীরবর্তী হওয়ার সুবাদে মাটি খুব উর্বরা - গাছগাছালির অন্ত নেই। সারাটা গ্রাম জুড়ে আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে অগুনতি নারকেল আর তাল গাছ। রয়েছে বড় ছোট পুকুর। মনে পড়ে ছেলেবেলায় কালীপুজোর সময় খুব সকালে জেলেরা বাড়ি বাড়ি এসে ডেকে বলে যেত পুকুরে মাছ ধরা হয়েছে - মাছের ভাগ নেবার জন্য পুকুর পাড়ে যেতে হত। বালতি ভর্তি মাছ নিয়ে বাড়ি ফিরতাম। আজ আর সেদিন নেই। গ্রামের প্রায় সব পুকুরই মাছ-চাষের জন্য লিজ দেওয়া হয়েছে। পুজোর সময় আর মাছ ধরা হয় না। বাজার থেকে মাছ কিনে আনতে হয় প্রয়োজনে।

মামার বাড়িতে গত পঞ্চাশ বছরে আর কেউ থাকে না। আমার দিদিমা, যাঁকে আমরা সকলে বড়মা বলে ডাকতাম, আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন সেই ষাটের দশকের প্রথম দিকে। সেই থেকে বাড়িতে তালা - রাত্রে মাইনে করা লোক এসে বাড়িতে শোয়। দাদা মশায় ছিলেন কবিরাজ। মায়ের কাছে শুনেছি তিনি আয়ুর্বেদ পড়তে গিয়েছিলেন কাশীতে। পসার বেশ ভালোই ছিল। ঘোড়ায় বা পাল্কিতে চড়ে আশেপাশের গ্রামে চিকিৎসা করতে যেতেন। সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন। বাড়ির বৈঠকখানাটাই ছিল রোগী দেখার ঘর - বই আর পুঁথিতে ঠাসা। আজ আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। ছোট বেলায় দেখেছি কবিরাজি ওষুধ তৈরির জন্য বড় ছোট নানা মাপের পাথরের খল নুড়ি, হাতির দাঁতের ছোট ছোট চামচ, ওজন করার তুলা দণ্ড ইত্যাদি নানান সব জিনিস। সেসব দেখে দাদামশায় মানুষটা কেমন ছিলেন মনে মনে একটা ধারণা করার চেষ্টা করতাম।

দাদামশাই কাশীতে যখন পড়তে যান, আমার ধারণা সেটা উনবিংশ শতকের শেষের দিক। ভাবতে অবাক লাগে সেই যুগে এমন একটা গণ্ডগ্রাম থেকে কিভাবে সাহস করে অত দূরে পড়তে গিয়েছিলেন। আজকের মত তখন পাকা রাস্তা ছিল না। তবে গ্রামের পাশ দিয়েই রয়েছে রেলপথ, সোজা চলে গেছে হাওড়া। আমার সঠিকভাবে জানা নেই উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে এই অঞ্চলে রেলপথ বসেছিল কী না। তবে দাঁইহাট শহর এবং পৌরসভা দুই-ই অতি প্রাচীন।

ভাগিরথী

নলহাটির পাশেই জগদানন্দপুর। সেখানে রয়েছে প্রাচীন মন্দির - প্রতিষ্ঠা ১২৪৮ সালের বৈশাখে। প্রবেশ পথের দরজার ওপরে খোদাই করা আছে। তবে মন্দিরের সেবাইতেরা দাবি করেন মন্দিরটি আরও প্রাচীন। দাঁইহাটের বাগটিকরা অঞ্চলে আরও একটি পোড়া মাটির অলঙ্করণ সমৃদ্ধ মন্দির দেখতে পাওয়া যায়। ফলকটি অদৃশ্য হওয়ায় প্রতিষ্ঠাকাল আর সঠিক জানা যায় না। বিশেষজ্ঞদের মতে মন্দিরটি স্থাপিত হয়েছিল ষোড়শ শতকে।

মামার বাড়ির কালীপুজোর উল্লেখ করেছি একেবারে শুরুতেই। প্রাচীন এই পুজোটি কবে শুরু হয়েছিল তার হদিস পাইনি। গত শতকের একেবারে প্রথমে মেটিয়ারি নিবাসী নিবারণ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'কাটোয়ার ইতিহাস' গ্রন্থে কালীপুজো (৺বড় ঠাকুরানীমাতার পুজা) এবং আমার দাদামশায় ৺চন্দ্রভূষণ ভট্টাচার্য্যের উল্লেখ রয়েছে। বইটির কথা জানতে পারি কাটোয়া কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক কালীচরণ দাসের কাছে - চোখে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি।

গ্রামটি উত্তর-দক্ষিণে ছড়ানো - উত্তরদিকে রেললাইন - ব্যান্ডেল-কাটোয়া রেলপথের অংশ। তিনদিকে পাকা রাস্তা রয়েছে। পশ্চিমদিকের পথ চলে গেছে মালডাঙ্গা এবং দক্ষিণের পথের একদিকে কাটোয়া অপরদিকে কালনা অর্থাৎ কালনা-কাটোয়া স্টেট হাইওয়ে। দাঁইহাটের পরের স্টেশন কাটোয়া - ইতিহাস

সমাজবাড়ি

প্রসিদ্ধ প্রাচীন শহর। শ্রী চৈতন্যদেব এখানে এসেছিলেন। কাটোয়া শহরের উত্তরে অজয় নদ গঙ্গা (ভাগিরথী) নদীতে মিশেছে। এই সংগমের উত্তরে অবস্থিত উদ্ধারণপুর - শ্মশান এবং সাধন ক্ষেত্র হিসাবে বিখ্যাত।
মামার বাড়ি এসে কয়েকটা দিন কাটানোর পরই মনটা আনচান করে, কাছাকাছি কোথাও ঘুরে আসতে ইচ্ছে হয়। সুযোগ পেলেই গায়ে পাঞ্জাবীটা চড়িয়ে ঝোলায় একটু মুড়ি, জল আর ক্যামেরাটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। আশেপাশেই অনেককিছু দেখার আছে। আর একটু সময় নিয়ে বেরোলে তো কাছেপিঠে অনেক জায়গাই রয়েছে। ভারতীয় রেল কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের সুবিধার জন্য কাটোয়া রেলস্টেশনে আশপাশের দ্রষ্টব্য স্থানের মানচিত্রসহ একটা তালিকা রেখেছেন। ওই তালিকাভুক্ত কয়েকটি জায়গা হল - লাভপুর (সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মস্থান), ফুল্লরা (শক্তিপীঠ), নানুর (বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাসের জন্মস্থান), অট্টহাস (দেবীপীঠ), সোনারন্দি (একটি রাজবাড়ি আছে), কেতুগ্রাম (দেবী বহুলার মন্দির), শ্রীপাট শ্রীখন্ড (পাটবাড়ি - নরহরি সরকারের জন্মস্থান), কাগ্রাম (কবি কুমুদ রঞ্জন মল্লিকের এবং চৈতন্যমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা কবি লোচন দাসের জন্মস্থান), ক্ষীরগ্রাম (দেবী যোগদ্যার মন্দির), মুগুরী, ছোট এবং বড় পোষলা (দেবী ঝংকেশ্বরী। গ্রামের লোকেরা বিষধর সাপকে দেবীজ্ঞানে পূজা করে), মাধাইতলা, কাটোয়া (শ্রীচৈতন্য শিষ্য মাধাইয়ের সমাধি), গৌরাঙ্গবাড়ি, কাটোয়া (শ্রীচৈতন্যদেব এখানে তাঁর গুরু কেশব ভারতীর কাছে দীক্ষা নেন এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করেন), সাঁখাই ঘাট (ভাগিরথী এবং অজয়ের সংগমস্থল), যাজিগ্রাম (শ্রীনিবাস আচার্য্যের জন্মস্থান)।

শৈশব থেকেই কালীপুজোর সময়টা মামাবাড়িতেই কাটে। পুজো উপলক্ষে কাটোয়ার উত্তরের গ্রাম থেকে ঢাকীরা আসে। এই ঢাকের আওয়াজ বড়ই মধুর। শহরাঞ্চলে ঢাকে চামড়ার বদলে সিনথেটিক পর্দার ব্যবহার হচ্ছে, তাই ঢাকের গমগম আওয়াজের পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। পুজোর আগের দিন সন্ধ্যায় ঢাকীরা চলে আসে। ঠিক সন্ধ্যার পরপরই মন্দিরের সামনে চত্বরে সকলে জমায়েত হয়ে ঢাক বাজাতে শুরু করে। সেই আওয়াজ আমার মত পরিণত বয়স্ককে আজও চঞ্চল করে তোলে। ঠাকুরের রঙ করা শুরু হয় এই সময়েই। এ দৃশ্য দেখার জন্যই তো ছুটে যাওয়া।

গ্রামের উত্তরদিকে জগদানন্দপুর। এখানে রয়েছে প্রায় ৮২ ফুট উঁচু পাথরের রাধাগোবিন্দ জিউয়ের মন্দির। এটি পঞ্চরত্ন মন্দির - প্রাচীর ঘেরা। উৎকৃষ্ট প্রস্তর শিল্পের নিদর্শন হওয়া সত্ত্বেও মন্দির সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের ঔদাসীন্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অধ্যাপক কালীচরণ দাস মহাশয় তাঁর বই "শুধু দুই পা ফেলিয়া"-তে এই মন্দিরটির বিশদ বিবরণ এবং ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। বাগটিকরা অঞ্চলের যে মন্দিরটির কথা আগে বলেছি সেটি পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ টেরাকোটা মন্দিরগুলির মধ্যে একটি। অথচ খুব কম মানুষই এর খোঁজ রাখেন। মন্দিরটি দাঁইহাটের বিখ্যাত চন্দ্র পরিবারের প্রতিষ্ঠিত। এই মন্দিরটি সম্বন্ধে অধ্যাপক দাস লিখেছেন, "বাগটিকরা টেরাকোটার মূর্তিগুলির সিংহভাগ অ-প্রাকৃত। মানুষ, দেব-দেবী কিম্বা পশুর পেশীগঠনে অসাধারণ নৈপুণ্য। খাজুরাহোর ভাবানুকরণে রয়েছে প্রাক্-মৈথুন দৃশ্য। রয়েছে বিত্তবানের নারী সম্ভোগ। দুর্গা কিংবা কালীর মূর্তি-গঠনে অদৃষ্টপূর্ব শিল্পবোধ কিন্তু মহাদেবের মূর্তি সাদা-মাটা, মুখমন্ডলে কোন লালিত্যের ছোঁয়া নেই। সব মিলিয়ে বাগটিকরায় এক দুর্লভ শিল্পের সমাবেশ। ..."

পোড়ামাটির মন্দির - বাগটিকরা

শুধুমাত্র একটি কালীমূর্তির কথাই বলব। এই বর্ণনা থেকেই বোঝা যাবে মন্দির গাত্রে টেরাকোটার মূর্তিগুলি কী অনন্যসাধারণ। অন্যত্র কোথাও এই মূর্তি আমার চোখে পড়েনি। এই কালীমূর্তির মুখমণ্ডল পশুর মত। দেবী এখানে চতুর্ভূজা। এক হাতে খড়্গ, অন্য হাতে ছিন্ন নরমুণ্ড। কোমরে ছিন্ন হস্তের মালা, গলায় ছিন্ন মুণ্ডের মালা। জিহ্বা সর্পের ন্যায়। পায়ের কাছে মহাদেবের বদলে মনুষ্য লিঙ্গ। এই জাতীয় কালীমূর্তি কল্পনা সত্যিই বিরল। বাগটিকরার মন্দির ছাড়া ভাউসিং অঞ্চলে আরও একটি পোড়া মাটির মন্দির রয়েছে। মন্দির গাত্র অলংকরণে কৃষ্ণলীলা, রামলীলার সঙ্গে রয়েছে দেবদেবীর মূর্তি। তবে ভাউসিং মন্দিরটি বাগটিকরার মন্দিরের তুলনায় নবীন।
দাঁইহাটের মন্দির দুটি সম্বন্ধে আলোচনায় অধ্যাপক দাস বর্ধমানরাজদের সমাজবাড়ি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। লিখেছেন - "দাঁইহাট পৌরসভার অধীনে টেরাকোটা সজ্জিত দুটি শিব মন্দির আছে। এই শহরের মধ্যে স্টেশনের কাছে বাগটিকরা অঞ্চলে, অন্যটি সরে যাওয়া গঙ্গার তীরে ভাওসিং-য়ে (জে.এল নং ৯১, প্লট নং ২৬১)। গঙ্গা এখন অনেক দূরে সরে গেছে। কয়েক-শো গজ উত্তরে ওই পরিত্যক্ত গঙ্গা-তীরে বর্ধমানের রাজা আবু রায় থেকে কীর্তিচাঁদ (মৃত্যু ১৭৪০ খৃষ্টাব্দ) পর্যন্ত সকলের ভস্ম সমাধি আছে বলে প্রকাশ।" সমাজবাড়ির কাছেই বর্ধমানরাজদের গঙ্গাবাস, বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত। কথিত আছে মারাঠা সেনাপতি (বর্গি দলপতি) ভাস্কর পণ্ডিত বর্ধমানরাজের গঙ্গাবাসে দুর্গাপুজো আরম্ভ করেন। তৎকালীন বাংলার নবাব আলিবর্দি খাঁ এই সংবাদ পেয়ে হঠাৎ ভাস্করদের আক্রমণ করেন। ভাস্কর পণ্ডিত পুজো ছেড়ে পালিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচান। এখানে কান পাতলে এমন কত গল্পই শোনা যায়। দাঁইহাটের গঙ্গা পার হলেই যাওয়া যায় অপর দিকের মেটিয়ারি বা মাটিয়ারি - পিতল-কাঁসা শিল্পের জন্য বিখ্যাত। বর্তমানে পিতল-কাঁসার ব্যবহার কমে যাওয়ার জন্য এই শিল্প মার খাচ্ছে।

দাঁইহাটের দক্ষিণে অগ্রদ্বীপ। এখানে গোপীনাথজীর পূজা উপলক্ষে মহোৎসব হয়।

বিরাট মেলা বসে। উত্তরে কাটোয়া পেরিয়ে বেশ কিছুটা গেলেই কর্ণসুবর্ণ রেল স্টেশন। কথিত আছে এখানেই ছিল রাজা শশাঙ্কের রাজধানী। এখানে এলে দেখা যাবে বড় মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ।

আমার মামার বাড়ির দেশের কথা বলে কোনদিনই শেষ করতে পারব না। তার আকর্ষণ আমার কাছে অফুরান।

তথ্যসূত্র - 'শুধু দুই পা ফেলিয়া' - ড. কালীচরণ দাস, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়

বাগটিকরা মন্দিরে পোড়ামাটির কালীমূর্তি

প্রাণীবিদ্যার অধ্যাপক অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়ের নেশা বেড়ানো আর ছবি তোলা। বাংলার গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে থাকা চোখের আড়ালে চলে যাওয়া টেরাকোটার মন্দিরশিল্পকে ক্যামেরার দৃষ্টিতে পুনরুদ্ধার করাই তাঁর ভালোলাগা। পাশাপাশি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ভ্রমণ ও অন্যান্য লেখা।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
Like Be the first of your friends to like this.
tell a Friend
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

রঙবাহারি রাজস্থান

দেবাশিস বসু

~ রাজস্থানের তথ্য ~ রাজস্থানের আরও ছবি ~

অনেকদিনের ইচ্ছে এবার বাস্তব হল - একটা লম্বা রাজস্থান ট্যুর। দলে আমরা দু'জন মহিলা সহ ছয় প্রবীণ নাগরিক। এবছরের ফেব্রুয়ারির একেবারে প্রথম দিনে রাতের যোধপুর এক্সপ্রেস ধরে বেরিয়ে পড়েছিলাম। ট্রেনে আড্ডা দিয়ে, ঘুমিয়ে কেটে গেল বেশ সময়টা। তিন তারিখ সকালে বিকানীর পৌঁছালাম - ঠিকানা হোটেল লালজি।

যেটা প্রথমে নজরে এল তা হল রাস্তার ধারে অধিকাংশ বাড়িই পাথরের আর রাজস্থানী স্থাপত্যে তৈরি। আর চারপাশে যেন রঙের উৎসব। মহিলাদের ঘাগরা-চোলি, উড়নিতে নানান রঙের ছোঁয়া। পুরুষদের লম্বা ঝুলের ধুতি আর শার্ট সাদা রঙের হলেও বাহারি পাগড়ির কনট্রাস্টে যেন আরও ঝলমলে হয়ে উঠেছে। পাগড়িও তেমনি বিশাল - শুধু রঙের বাহারই নয়, পরারই কৌশল নাকি আট রকমের। পুরুষদের চেহারায় আরেক চোখে পড়ার বিষয় হল গোঁফ - কারোর বেশ চওড়া আর মোটা, আবার কারোর দাড়ির সঙ্গে জুড়ে গিয়ে আরও জমকালো হয়ে গেছে। অবশ্য স্থানীয় পোষাক ছাড়াও আধুনিক নানা পোষাকে সজ্জিত নারীপুরুষের সংখ্যাটাও নেহাত কম নয়। আরেকটা জিনিস খুব চোখে পড়ছিল যত্রতত্র, সেটা হল উটে টানা গাড়ি।

সোয়া এগারটা নাগাদ ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। অটোয় গন্তব্য ৩২ কিলোমিটার দূরে কর্ণি মাতার মন্দির। দেবী দুর্গারই এক রূপ এই কর্ণিমাতা। ছ'শো বছরের প্রাচীন বেশ বড় মন্দির। ১৭ শতকে তৈরি মন্দিরটির চূড়ায় সোনার ছাতা। বিশাল গেটে রুপোর পাতে সূক্ষ্ম কারুকাজ। মন্দিরের মার্বেলের কারুকার্যও দেখার মত। এই মন্দিরের বিশেষত্ব হল বিরাট চত্বরে অনেক ইঁদুর ঘুরে বেড়াচ্ছে, এরা দেবীর কাছে উৎসর্গীকৃত, গায়ে চড়লে পুন্যি কিন্তু পায়ের চাপে মরে গেলেই পাপ, তাই খুব সাবধানে হাঁটতে হচ্ছে। বেশ বড় কানা উঁচু থালায় দুধ রাখা আছে, ইঁদুরগুলো কানা বেয়ে উঠে দুধ খাচ্ছে। ইঁদুরকে খাওয়ানোও এখানে পুণ্যের কাজ। বিকেল সন্ধ্যায় হেঁটে সঙ্কটমোচন হনুমান মন্দির, শ্রীকৃষ্ণ মন্দির এসব দেখা হল।

চার তারিখে সারাদিনের ঘোরার প্ল্যান - ভাড়া গাড়িতে সকাল সাড়ে নটা নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম সদলবলে। প্রথম গন্তব্য রামপুরিয়া হাভেলি। রাজস্থানের এই হাভেলিগুলি অতীতের বিত্তশালী ব্যবসায়ীদের তৈরি। সরু গলিতে চার-পাঁচতলা বিশেষ ধরণের বাড়ি। পাথরের জাফরিতে, ঝুলন্ত জানলায়, খিলানে দক্ষ শিল্পীর হাতের কাজ। এই বাড়িগুলো নাকি গরমে ঠাণ্ডা আর শীতে গরম থাকে। শহর থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে ১৪ শতকের তৈরি ভাণ্ডেশ্বর জৈন মন্দির কমপ্লেক্স। মন্দির নির্মাতা দুই ভাইয়ের নাম ভাণ্ডেশ্বর আর ষণ্ডেশ্বর। ভাণ্ডেশ্বরের মন্দির সাজানো কাচ আর ফ্রেস্কোর কাজে আর ষণ্ডেশ্বরের বৈশিষ্ট্য এনামেল আর সোনায় মোড়া কারুকার্য। লক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দিরটিও বেশ বড় আর সুন্দর।

জুনাগড় ফোর্ট, বিকানীর

বিকানীর শহরের ঠিক মাঝখানে জুনাগড় দুর্গ। ১৫৮৭-১৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের প্রাক্তন সেনাপতি রায়সিং লাল ও গোলাপি বেলেপাথরে এই দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। বর্গাকার দুর্গ ৩০ ফুট গভীর পরিখায় ঘেরা। মূল প্রবেশপথ সূরয পোল। দুর্গ চত্বরের ভিতরে অজস্র দ্রষ্টব্য - লাল নিবাস, চন্দ্রমহল, ফুলমহলের রঙিন কাঁচের কারুকার্য, ইতালীয় মোজাইক, জাফরির অপূর্ব কাজ, বাদলমহল, বর্ণাঢ্য সূর্যনিবাস বা দরবার হল, গঙ্গানিবাস, দুর্গানিবাস, মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবকে যুদ্ধে হারানোর স্মারক করণমহল, শিসমহল, ছত্তরমহল, বিজলিমহল, রাজপরিবারের গৃহদেবতা শিবঠাকুরের মন্দির, হাজারি দরোয়াজা মিউজিয়াম, মিনিয়েচার পেন্টিং, চিনি বুরুজ বা সবুজ-সাদা রঙের চিনা টাওয়ার ইত্যাদি - একের পর এক দেখছি আর অপার বিস্ময়ে শুধু মুগ্ধ হচ্ছি।

গঙ্গা গোল্ডেন জুবিলি মিউজিয়ামে দেখলাম গুপ্ত রাজাদের সময়কার টেরাকোটার কাজ, প্রাক্ হরপ্পাকালের নানান সংগ্রহ, রাজা রাজসিংহকে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গিরের দেওয়া নজরানা সিল্কের পোশাক, সাদা মার্বেল পাথরের অপরূপ সুন্দর দেবী সরস্বতীর মূর্তি, রাজকীয় আবরণ-আভরণ, অস্ত্র-শস্ত্র, প্রচুর মূর্তি ও ছবি।

এর পরের গন্তব্য লালগড় প্রাসাদ ও মিউজিয়াম। শহর থেকে আড়াই কিলোমিটার দূরে মহারাজ গঙ্গা সিং তাঁর পিতা মহারাজ লালসিং-এর স্মারকরূপে, স্যার স্যুইনটন জ্যাকবের নক্সায়, গেরুয়া রঙের বেলেপাথরে লালগড় প্রাসাদ তৈরি করেন। প্রাসাদের স্থাপত্যে পাশ্চাত্যের শিল্প জৌলুসের সঙ্গে মিশেছে প্রাচ্যের কল্পনার জগত - বেলজিয়ামের ঝাড়লন্ঠন, কাট-গ্লাসের অলঙ্করণ, অপরূপ জালির কাজ, সুন্দর সুন্দর কার্ভিং, নকশাকাটা কারুকার্য, প্রচুর ছবি, স্টাফড্ জীবজন্তু নিয়ে সাজানো প্রাসাদ। প্রাসাদ চত্বরে রয়েছে ফুলবাগান, বিকানির স্টেট রেলওয়ের বগি আর চিড়িয়াখানা। প্রাসাদের এক অংশ এখন বিলাসবহুল হোটেল। অন্য একটি অংশে বাস করেন রাজপরিবারের বর্তমান প্রজন্ম। দ্বিতলে রয়েছে রাজপরিবারের নানা সংগ্রহ নিয়ে শাদুল মিউজিয়াম ও অমূল্য দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত বইয়ের অনুপ লাইব্রেরি।

এদিনের শেষ দ্রষ্টব্য ছিল ক্যামেল ব্রিডিং ফার্ম। এখানে উট প্রজনন বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের জন্য নানা রকম ব্যবস্থা আছে। জানা গেল রাজস্থানে উট মুখ্যতঃ চার প্রজাতির - বিকানেরি, জয়সলমেরী, মেয়ারী ও কচ্ছি। ভারতে অবশ্য আরও একরকমের উট পাওয়া যায়, লাদাখের শীতল মরুভূমিতে দুটো কুঁজওয়ালা উট।

পাঁচ তারিখ সকালে বিকানির থেকে রওনা দিয়ে জয়সলমীর পৌঁছালাম দুপুর নাগাদ। আজ প্যাকেজ প্রোগ্রামে ঘোরা। হোটেল থেকে গাড়িতে ৫০ কিমি দূরে সাম ডিউন - মরুভূমির দেশ। এখানে আমাদের থাকার ব্যবস্থা সুইস টেন্টে। ওই গাড়িতেই ২৫-৩০ কিমি দূরে সানসেট পয়েন্টে গিয়ে মরুভূমির বুকে একটা অসম্ভব সুন্দর সূর্যাস্ত দেখলাম। সন্ধেবেলায় লোক সঙ্গীত ও নৃত্যের সঙ্গে গরম গরম পকোড়া আর কফি। পরদিন সকালে সাম ডিউনসের শেষ অভিজ্ঞতা আধঘন্টার উট সাফারি। উটের বসা অবস্থায় পিঠে চড়ার পর সে ক্রমশ সোজা হয়ে দাঁড়াচ্ছে আর আমি জটায়ুর মতোই শিহরিত হচ্ছি।

জয়সলমীরের হোটেলে পৌঁছে আবার গাড়ি ভাড়া করে বেরিয়ে পড়লাম। গন্তব্য সোনার কেল্লা। শীতের দুপুরের নরম রোদে হলুদ বেলেপাথরের দূর্গ যেন সোনার মতই ঝলমল করছে। আমাদেরতো মনে হচ্ছিলই, স্থানীয় গাইড আর সিকিউরিটির লোকজনও বারবার সত্যজিৎ রায়ের নাম করছিলেন, সারা পৃথিবীর সামনে সোনার কেল্লাকে তুলে ধরার জন্য। শহরের দক্ষিণ দিকে ৭৬ মি উঁচু ত্রিকূট পাহাড়ের ওপর এই দুর্গ। দৈর্ঘে প্রায় ৪৬০ মি, প্রস্থে ২৩০ মি। প্রাচীনত্বের দিক দিয়ে চিতোরের পরেই এর স্থান। বৃত্তাকার প্রাচীর ঘেরা এই দুর্গে মোট ৯৯ টি বুরুজ আছে। দুর্গের অনেকগুলি গেট বা পোল রয়েছে। অক্ষয় পোল, গণেশ পোল, সূরজ পোল, হাওয়া পোল পেরিয়ে এঁকেবেঁকে রাস্তা চলেছে। প্রথমেই পাঁচ মহলা, সাত তলা মহরাওয়াল বা সিটি প্রাসাদ। জুনা মহলের জালির কাজ খুব সুন্দর। সাধাসিধে জেনানা মহলের পর চৌহাটা পেরিয়ে মর্দানা মহল। হাওয়া পোলের ওপরে আছে কাচ ও ম্যুরাল চিত্রে ভরা রঙমহল। সর্বোত্তম বিলাসে নীল টালি আর মোজাইকের সুন্দর কাজ। পাশেই গজবিলাসে পাথরের সুন্দর অলঙ্করণে মোতি মহল। সামনে আম দরবার। আর এক আকর্ষণ মহারাজ বারিসালের গড়া বাদলবিলাস বা মেঘ দরবার বা টাওয়ার অফ ক্লাউডস্। এর শীর্ষে মুঘল স্থাপত্যের তাজিয়া মিনার আছে। দেওয়ান-ই-আম-এর পাথরের সিংহাসনও অনবদ্য। কাছেই নারায়ণ ও শক্তি স্তম্ভ আছে।

জৈন মন্দির, সোনার কেল্লা - জয়সলমীর

পরবর্তী গন্তব্য গদীসর বা গদীসাগর - মরুভূমির মাঝে মরুদ্যান। এর অনেকগুলি ঘাট। মাথায় কলসির ওপর কলসি বসিয়ে রাজস্থানী মেয়েরা জল নিতে এসেছে। জলাশয়কে ঘিরে রয়েছে অনেকগুলি মন্দির। কারুকার্যময় তোরণ। কাছেই রয়েছে পাঁচতলা তাজিয়া।

সেলিম সিং হাভেলি আর নাথমলজী কী হাভেলির পাথরের অপূর্ব জাফরির কাজ দেখে ফেরার পথ ধরলাম।

সাত তারিখ ভোরবেলাতেই ট্রেনে যোধপুর পৌঁছলাম। পৌনে এগারটা নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম সারাদিনের জন্য। প্রথম গন্তব্য শহর থেকে ৫ কিমি দূরে ১২১ মি উঁচু গোদাগিরি পাহাড় অবস্থিত মেহেরণগড় দুর্গ। ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দে রাও যোধা দুর্গটি নির্মাণ করেন। কোথাও গোল কোথাওবা চারকোনা গম্বুজ রয়েছে দুর্গ প্রাচীরের গায়ে। প্রাসাদ, সৈন্যাবাস, মন্দির, ঘরবাড়ি নিয়ে একসময় জমজমাট এই দুর্গ মুঘলদের কাছেও অজেয় ছিল। যোধপুরের রাজবংশের সঙ্গে মিত্রতাও গড়ে উঠেছিল মুঘলদের। আকবরের প্রধানা মহিষী যোধাবাঈ ছিলেন উদয়পুরের রাজকন্যা, রাও উদয়সিংহের ভগ্নী। উদয়সিংহ জাহাঙ্গিরের সঙ্গে নিজের কন্যার বিবাহ দেন। ১৫৮১ খ্রিস্টাব্দে উদয় সিংহকে রাজা খেতাব দেন সম্রাট আকবর। পর্যটকদের কাছে দুর্গের আকর্ষণ এখন মিউজিয়াম হিসেবে।

মেহেরণগড় দুর্গ, যোধপুর

দুর্গে ঢোকার সাতটি পোল রয়েছে - ফতে পোল বা গেটওয়ে অফ ভিকট্রি মুঘলদের যুদ্ধে পরাজিত করবার স্মারকরূপে গড়ে তোলা হয়েছিল, গোপাল পোল, দোধকাংড়া পল, জয় পোল, ১৮০৬-এ মহারাজ মানসিংহের তৈরি লোহা পোল, সূরজ পোল ইত্যাদি। মহলের পর মহল রাজকীয় বৈভব আর নান্দনিকতায় পরিপূর্ণ। মোতিমহল বা দেওয়ান-ই-আম-এ শ্বেতপাথরের করোনেশন থ্রোন। মহারাজা অভয় সিংহের তৈরি ৮০ কেজি সোনার সুন্দর কারুকার্যময় ফুলমহল বা দরবার হল। সোনালী রঙের থাম, খিলানে আর ছাদে সোনালী নকসা কাটা ফুল। শিলেখানায় রয়েছে রণসাজ ও অস্ত্রশস্ত্রের প্রদর্শনী, প্রচুর ছবি। আর রয়েছে সাড়ে সতেরো কিলো ওজনের তালা, কিংখাবে মোড়া নানা রকম হাওদা, দোলনা ইত্যাদি। জেনানা মহল বা রাজার হারেমে জাফরির অভিনবত্, চন্দনকাঠের সিলিং, আয়নাখচিত দেওয়াল নজর কাড়ে। দুর্গের ভেতরে দুটি তালাও - রানী সাগর ও গুলাব সাগর। র‍্যামপার্টে রয়েছে কামানের সংগ্রহ। কেল্লার আরাধ্যা দেবী চামুন্ডার মন্দির দেখে বেরিয়ে সাঁইবাবার মন্দির ও কৈলানা লেক ঘুরে ফিরে এলাম।

আট তারিখ সকালে উঠে বেরিয়ে পরলাম ওশিয়াঁর উদ্দেশে। এখানে মাতাজির মন্দির আছে, মা দুর্গারই আরেক রূপ। দুর-দুরান্তর থেকে মহিলারা সন্তান কামনায় এখানে পুজো দিতে আসেন। এছাড়া ষোলটি সুন্দর স্থাপত্য শিল্পের জৈন মন্দির রয়েছে।

লঙ্কার রাজা রাবণের স্ত্রী মন্দোদরীর দেশ ছিল নাকি মন্দোর বা মান্ডোর। এখানে সুসজ্জিত উদ্যানে লাল বেলে পাথরের সুন্দর ভাস্কর্যের ছত্তিশ বা মন্দির আছে। মিউজিয়াম ছাড়াও যেটা খুব ভাল লাগল তা হল ১৮ শতকে একটি মাত্র পাথর কুঁদে তৈরি ৩৩ কোটি দেবদেবী শোভিত 'হল অফ হিরোজ'।

যোধপুর শহরের একপ্রান্তে ইতালীয় শৈলীতে গোলাপী মার্বেল পাথর আর লাল বেলে পাথরের প্রাসাদ উমেদ ভবন। এটি অবশ্য তেমন প্রাচীন নয়। এর নির্মাণকাজ শেষ হয় ১৯৪২ সালে। এখানে আছে সোনায় মোড়া পৌরাণিক আখ্যান চিত্রিত দেওয়ানি খাস, দেওয়ানি আম, থ্রোন রুম, পাঠাগার ভবন, মহারাজ উমেদ সিং-এর বিমান, নানারকম অস্ত্রশস্ত্র আর বিচিত্র সব ঘড়ি - আংটিতে ঘড়ি, টিকলিতে ঘড়ি, ঘড়ির আওয়াজে পাখির গান এমন নানারকম।

ন'তারিখ বেলা পৌনে বারটা নাগাদ রণকপুর পৌঁছলাম। এখানে জনবসতি নেই। আছে শুধু ১২ থেকে ১৫ শতকে তৈরি জৈন মন্দিরগুলি। কোনটা ছেড়ে কোনটাকে ভালো বলব, সবই যেন একেকটি শ্বেতপাথরের কাব্য! মন্দির আছে আদিনাথের, নেমিনাথের ও পার্শ্বনাথের। আদিনাথের মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য - শিল্প সুষমায় উজ্জ্বল চারটি প্রবেশপথ প্রথমেই নজরে পড়ে। সুন্দর কারুকার্যমন্ডিত ১৪৪৪টি স্তম্ভ আর মন্দিরগাত্রের অপরূপ ভাস্কর্যশৈলী। এছাড়া সূর্য্যনারায়ণ ও অম্বামাতার মন্দির রয়েছে। চারপাশে প্রচুর হনুমান আর ময়ূর নজরে পড়ল। দুপুরে আবু রোডে পৌঁছে সন্ধ্যেবেলায় নক্কি লেকের আশপাশে ঘুরে বেড়ালাম।

দশ তারিখ সকালে গন্তব্য শহর থেকে ১৫ কিমি দূরে রাজস্থানের সর্ব্বোচ্চ শিখর ১৭৭২ মি উচ্চ গুরুশিখর। মনোরম পরিবেশে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের মন্দির। তিনশ সিঁড়ি ভেঙ্গে পৌঁছলাম অত্রি ঋষির মন্দিরে। এখানে গুরু দত্তাত্রেয়র পায়ের ছাপ আছে। গুরুশিখর থেকে নেমে ফুলবাগানে সাজানো ব্রহ্মকুমারীদের শান্তিবন বা পিসপার্কে পৌঁছে খানিকক্ষণ ধ্যানের বিষয়ে বক্তৃতা শুনে বেরিয়ে পড়লাম অচলগড়ের দিকে। একসময়ের চৌহান রাজধানী অচলগড় পরে রানা কুম্ভের দখলে আসে। ভেঙ্গে পড়া দুর্গের নীচে ৮১৩ শতকে তৈরি অচলেশ্বর মন্দির। এখানে শিবের প্রতিভূ পাথরের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ। দেওয়ালে পার্বতী ও গণেশ মূর্তি আছে। ধাতুর তৈরি নন্দীমূর্তিও রয়েছে। পাশের মন্দিরে অধিষ্ঠান করছেন দশাবতাররূপী বিষ্ণু। চামুন্ডা দেবীর মন্দিরও রয়েছে।

গুরু শিখর, মাউন্ট আবু

এবারে আমাদের গন্তব্য বিশ্ববিখ্যাত দিলওয়ারা বা দেলওয়াড়া মন্দির। মোট পাঁচটি মন্দির - আদিনাথ, নেমিনাথ, মহাবীর, ঋষভদেব ও পার্শ্বনাথ। শ্বেত পাথরের ওপর অনবদ্য সূক্ষ্ম কারুকাজ। গুজরাতের প্রথম সোলাঙ্কি রাজা ভীম দেবের মন্ত্রী বিমল শাহ ১০৩১ সালে ১৮ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে, পনেরোশো শিল্পী ও বারোশো শ্রমিকের শ্রমে চোদ্দ বছর ধরে গড়ে তোলেন বিমল বাসাহি, সেখানে রয়েছেন, প্রথম জৈন তীর্থঙ্কর আদিনাথ। মন্দিরের সূক্ষ্ম অলঙ্করণে আছে হাতির যূথ সারি, ফলমূল, জীবজন্তু শোভিত অষ্টভূজাকার গম্বুজ, আটচল্লিশটি থামসহ অলিন্দের স্থাপত্য, দেবদেবীর মূর্তি সম্বলিত ৫২ টি কুঠুরি, শ্বেতপাথরের কার্ভিং ও সিলিং-এর সুন্দর ও সূক্ষ্ম কারুকার্য। গুজরাতরাজ বীর ধাওয়ানের সময় তাঁর দুই মন্ত্রী বাস্তুপাল ও তেজপাল আদিনাথ মন্দিরের উত্তরে দুটি মন্দির - লুনা বাসাহি ও তেজপাল মন্দির তৈরি করান ১২ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে। লুনা বাসাহিতেও শ্বেতপাথরের সুন্দর ভাস্কর্যমন্ডিত স্তম্ভ, ঝালর, নাচের মুদ্রা, যেন জল থেকে তুলে আনা পদ্ম, তোরণ, চেন, জীন আখ্যান, রাজকীয় মিছিল - দক্ষ শিল্পীদের করা অপূর্ব সুন্দর কাজ। এখানে রয়েছেন বাইশতম জৈন তীর্থঙ্কর নেমিনাথ। মূল মন্দিরের দুপাশে দেওরাণী-জেঠাণী মন্দিরের কারুকার্যেও নূতনত্ব আছে। লুনা বাসাহির বিশেষ আকর্ষণ রঙ্গমন্ডপ। ষোলটি দেবদেবীর মূর্তি, গম্বুজের চারপাশে বাহাত্তর জন তীর্থঙ্কর সহ তিনশ ষাট জন জৈন সন্ন্যাসীর মূর্তি আছে। তুলনামূলকভাবে ১৫ শতকে তৈরি মহাবীর, ঋষভদেব ও পার্শ্বনাথ মন্দিরগুলির অলঙ্করণ অনেকটাই নিস্প্রভ।

পিছোলা লেক, উদয়পুর

এদিনের শেষ গন্তব্য আরাবল্লী পাহাড়ে সানসেট পয়েন্ট। পাহাড়ের গায়ে সূর্যাস্ত দেখার জন্য ঘেরা জায়গায় বেশ কিছু বসার আসন আছে। ওপারেই গভীর খাদ। ঠিক সূর্যাস্তের মুহূর্তে মনে হল আকাশ থেকে সূর্য বুঝি টুপ করে খসে পড়ল। এই নৈসর্গিক শোভা অপরূপ। এগার তারিখ সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ রওনা দিয়ে উদয়পুর পৌঁছলাম প্রায় দুপুর একটায়। মহারানা উদয় সিং, যিনি সূর্যবংশীয় রামচন্দ্রের উত্তরপুরুষ বলে পরিচিত, ১৫৬৯ খ্রিস্টাব্দে আরাবল্লী পাহাড়ের ঢালে, পিছোলা লেকের পাড়ে ৫৭৭ মি উচ্চতায় এই শহর গড়ে তোলেন। একে ভেনিস অফ দ্য ইস্ট-ও বলা হয়। মনোহর হ্রদ, মর্মর প্রাসাদ, সুসজ্জিত উদ্যান আর প্রাচীন মন্দির নিয়ে উদয়পুর শহর। এখানে প্রাসাদ আছে মোট পাঁচটি - সিটি প্যালেস, জগনিবাস, জগমন্দির, লক্ষ্মীবিলাস ও মনসুন প্যালেস। প্রতিটি প্রাসাদের নির্মাণশৈলী ও অলঙ্করণ ভিন্ন ভিন্ন।

প্রথমে যাই সিটি প্যালেসে। এটি রাজস্থানের বৃহত্তম রাজপ্রাসাদ ও মহারাণার শীতকালীন আবাস। প্রথম বড়ি পোল হয়ে ত্রিপোলিয়া গেট, যাতে তিনটি খিলান ও আটটি তোরণ আছে। ত্রিপোলিয়ার পরে গণেশ দেউড়ি, শিশমহল, কৃষ্ণা ভিলা, ভীম ভিলা, ছোট চিত্রশালি, দিলখুসমহল, মানকমহল, মোতি মহল, বড়ি মহল আর ১৬৭৬ সালে তৈরি কাঁচ কি বুরুজ। সব মিলিয়ে এগারটি মহল। প্রতিটি মহলই সূক্ষ্ম কারুকার্যমন্ডিত। মোরচকে ১৯ শতকে নির্মিত পাঁচহাজার টুকরো রঙবেরঙের কাঁচ বসিয়ে ময়ূরের প্রতিকৃতি এককথায় অপূর্ব - সূর্যের আলোয় প্রতিফলন হয় নীল, সবুজ, সোনা রঙে। অন্য এক ঘরে সূর্যমূর্তি, মানক বা রুবিমহলে কাচ ও পোর্সিলিনের সুন্দর সুন্দর মূর্তি। কৃষ্ণকুমারীর মহল কৃষ্ণবিলাসে রাজস্থানী মিনিয়েচার চিত্র, করণ সিং-এর তৈরি জানলা বিহীন জেনানা মহলে ফ্রেস্কোচিত্রে আঁকা কৃষ্ণগাথা, চরকুঠুরি, ঝুলবারান্দা, রঙীন দেওয়াল মেঝে, রংবেরং-এর কাচের জানালা - সবই খুব সুন্দর আর দৃষ্টিনন্দন। আর রানিমহলে আছে রানিদের ব্যবহৃত নানাধরণের পালকি, হাওদা ও ঘোড়ার গাড়ি। মোতিমহলে কাচের সুন্দর কারুকার্য, চিনি কি চিত্রমহলে চীনা ও ডাচ শিল্পীদের করা অলঙ্করণও মনোমুগ্ধকর। কারুকার্যময় শিখরে বিষ্ণু-কৃষ্ণ ও অপ্সরাদের নানা আখ্যান খোদাই করা আছে। প্রাসাদের এক অংশে সরকারি মিউজিয়াম। আরেক অংশে হোটেল। অন্য এক অংশে রাজপরিবারের বংশধরেরা বসবাস করেন। প্রাসাদের গায়েই ১৪ শতকে তৈরি ১০ বর্গ কিমি জুড়ে পিছোলা লেক। চারদিকে পাহাড় ঘেরা, জল আসছে ১৬০ কিমি দূর থেকে। জলাশয়ের মাঝে মাঝে দ্বীপ, দ্বীপের মাঝে প্রাসাদ আর মন্দির। একদিকে সুন্দর বাগান আর অন্যদিকে ঘাটের পর ঘাট। লেকে বোটিং-এর ব্যবস্থাও আছে। পূর্ণিমা রাতে এই লেকের দৃশ্য মনোমুগ্ধকর। এই লেককে ঘিরে ছড়িয়ে আছে নানান গল্পকথা। প্রচলিত কথা, পিছোলার জল পান করলে তাকে আবার এখানে ফিরে আসতেই হবে। লেকের মাঝে এক দ্বীপে রয়েছে এক নর্তকীর স্মৃতিস্তম্ভ। জনশ্রুতি, মহারাণার সঙ্গে এক নর্তকীর এই শর্ত হয় যে, সে যদি, দড়ির ওপর নাচতে নাচতে এপার ওপার করতে পারে পুরস্কারস্বরূপ অর্দ্ধেক রাজত্ব পাবে। সে প্রায় অন্য পাড়ে পৌঁছে যাচ্ছে দেখে প্রধান মন্ত্রী দড়িটি কেটে দিলে নর্তকীর সলিল সমাধি হয়।

পরবর্তী গন্তব্য ফতেহ সাগর ও নেহরু পার্ক। ১৯৩৭ সালে দুর্ভিক্ষের সময় সাধারণ মানুষকে কাজ যোগাতে বৃন্দাবন গার্ডেনের আদলে এটি তৈরি করানো হয়। জলাশয়ের মাঝে ১৫০ ফুট উঁচু সুদৃশ্য ফোয়ারা আছে। উত্তরে প্রতাপ মেমোরিয়াল আর বাকি তিনদিক পাহাড়ে ঘেরা। বারো তারিখ সকাল দশটা নাগাদ জলখাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম গুলাব বাগ বা সজ্জননিবাস দেখতে। পিছোলা লেকের ঠিক পাশেই একশ একর জায়গা জুড়ে এই প্রাসাদ কমপ্লেক্সটি ১৮৫৯-৭৪ খ্রিস্টাব্দে গড়ে তোলেন মহারাণা সজ্জন সিং। এখানে রয়েছে নওলাক্ষা ভবন, ভিক্টোরিয়া হল বা সরস্বতী ভবন, কমল তালাও আর ছোটদের মনোরঞ্জনের জন্য মিনি ট্রেন, অল্পদূরেই চিড়িয়াখানা। গোলাপ বাগে দেশি-বিদেশি দুষ্প্রাপ্য সব গোলাপ আছে।

সহেলিয়োঁ কে মঞ্জিল, উদয়পুর

ফতেহ সাগরের পাড়ে, চারটি পদ্মপুকুরের মাঝে ফোয়ারা দিয়ে সাজানো অভিনব বাগিচা সহেলিয়াঁদের বাড়ি। বাগিচার মধ্যস্থলে রয়েছে কালো পাথরের সূক্ষ্ম কারুকার্যমন্ডিত ছত্রি। এই ছত্রিগুলি রাজস্থানী স্থাপত্যের অন্যতম সুন্দর নমুনা। সাধারণতঃ ৫/৬ ফুট চৌকোকার। চারকোণে চারটি থাম, শিখরযুক্ত গম্বুজাকৃতি ছাদ। মধ্যস্থলের ছত্রির ছাদের চারদিক দিয়ে বর্ষার জলের মত ঝরনার জল পড়ছে, আর তাতে বৃষ্টির মত আওয়াজ হচ্ছে। তাই একে 'বিন বাদল বরসাত/বারিশ' বলা হয়। এই বাড়ি নিয়ে দুটি জনশ্রুতি আছে। একমতে এটি রাজপরিবারের মহিলাদের বেড়াবার জায়গা ছিল। অন্যমতে মুঘল দরবার থেকে ভেট পাওয়া মুসলিম নর্তকীদের বাসস্থান।

সোয়া বারটা নাগাদ উদয়পুর ছেড়ে উত্তরে কুম্ভলগড়ের রাস্তা ধরলাম। দূরত্ব ৮৪ কিমি। ১৪৫৮ সালে পাহাড়ের ওপর ১০৮৭ মি উচ্চতায় এই দুর্গটি গড়ে তোলেন রানা কুম্ভ। এই কুম্ভলগড়েই সেই ইতিহাস বিখ্যাত ঘটনাটি ঘটেছিল - ধাত্রী পান্না বাঈ, রানা উদয় সিং-এর শৈশবাবস্থায় ঘাতকের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য নিজের সন্তানকে ঘাতকের হাতে তুলে দেন। এই বিশাল দুর্গকে ঘিরে আছে ৩৬ কিমি লম্বা ও ৪ কিমি চওড়া প্রাচীর। প্রাচীরটি সাতটি বুরুজ ও তোরণে সজ্জিত। রাজস্থানের দুর্গের ইতিহাসে প্রাচীনত্বের দিক দিয়ে চিতোরের পরেই এর স্থান। দুর্গের ভিতর মহলের পর মহল তালাবন্ধ। যেটুকু দেখা যায় তার মধ্যে রয়েছে অনবদ্য দরবার হল বা মেঘ দরবার। অভিনবত্ব আছে জেনানা মহল ও মর্দানা মহলে। রাম পোলের কাছে মন্দিরগুলিও দর্শনীয়। নীচে দ্বিতীয় শতকের কিছু জৈন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। দুর্গের অভ্যন্তরে রানা কুম্ভের ছত্রী বা সমাধি ছাড়া, কালী, নীলকণ্ঠ, কুম্ভস্বামী ও মহাদেব মন্দির আছে। দুর্গের ছাদ থেকে দৃশ্যমান কুম্ভলগড় স্যাংচুয়ারি।

হলদিঘাট মিউজিয়াম, চিতোর

কুম্ভলগড় থেকে বেরিয়ে সন্ধ্যেবেলায় হলদিঘাটে পৌঁছে রানা প্রতাপের মিউজিয়ামে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো দেখলাম। ১৫৭৬ সালের ২১ জুন এই হলদিঘাটের প্রান্তরেই রানা প্রতাপের সঙ্গে আকবরের যুদ্ধ হয়েছিল, যা হলদিঘাটের যুদ্ধ বলে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। মিউজিয়ামে রানা প্রতাপ ও তার প্রিয় ঘোড়া চেতকের অনেক মূর্তি আছে। আছে চেতকের স্মৃতি সৌধ। রানা প্রতাপের সেনাপ্রধান হাকিম খান সুরীর সমাধি। আর বেশ বড় গোলাপবাগ। এখানে গোলাপফুলজাত নানা টুকিটাকি দ্রব্যাদি কিনতে পাওয়া যায়। হলদিঘাট থেকে সাতটা নাগাদ বেরিয়ে আধঘন্টার মধ্যে পৌঁছলাম নাথদ্বারা। এদিনের রাতঠিকানা।

তেরো তারিখ সকালে রওনা হলাম চিতোরের উদ্দেশ্যে। পথে শ্রীসাঁওয়াল শেঠজীর মন্দির ও একটি শনি মন্দির দেখে নিলাম। দুপুর দেড়টা নাগাদ চিতোর পৌঁছলাম। এই সেই ঐতিহাসিক দুর্গ - রানি পদ্মিনীর রূপে আকৃষ্ট হয়ে চিতোর আক্রমণ করে ধ্বংস করেন আলাউদ্দিন খিলজি। আর রানি পদ্মিনী সম্মান বাঁচানোর জন্য দুর্গের সব নারীদের নিয়ে জহর ব্রত পালন করে অগ্নিতে আত্মাহুতি দেন।

এই শহরের হাওয়ায় শোনা যায় -
"গড় তো চিতোরগড়, ঔর সব গড়ৈয়া,
রানি তো রানি পদ্মিনী, ঔর সব গধৈঁয়া।"

সে তর্ক বা আলোচনায় যাব না, বরং আমরা চিতোরগড় দেখি। ১৫০ মি উঁচু এক পাহাড়চূড়ায় ৭০০ একর জায়গা জুড়ে বিস্তৃত প্রাচীন এই দুর্গ ৫ কিমি দীর্ঘ প্রাকারে ঘেরা। দুর্গে মোট সাতটি পোল বা ফটক আছে। প্রথম বাদল পোল। সূক্ষ্ম ভাস্কর্যমন্ডিত এই পোলটি রাজকুমার বাঘ সিং-এর স্মৃতিস্মারক। দ্বিতীয় ভৈঁরো বা টুটা পোল, তৃতীয় হনুমান পোল, চতুর্থ গণেশ পোল, পঞ্চম জোড়লা পোল, ষষ্ঠ লক্ষণ ও সপ্তম রামপোল। দুর্গের অন্দরে রয়েছে ১১ শতকে তৈরি কারুকার্যময় জৈন মন্দির। মন্দিরে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তিও আছে। পূর্বদিকে সুরয পোল-এ নীলকান্ত মহাদেবের মন্দির। এখানে ১২ শতকে জিজা নামে এক জৈন ব্যবসায়ীর গড়া কীর্তিস্তম্ভ আছে। ২২ মি উচ্চ এই স্তম্ভটি নানা ভাস্কর্যে অলঙ্কৃত এবং জৈন তীর্থঙ্কর আদিনাথের নামে উৎসর্গীকৃত। রানা কুম্ভ মালোয়ার সুলতান মামুদকে হারিয়ে চিতোর পুনরুদ্ধারের পর এই জয়ের স্মৃতিস্বরূপ একটি জয়স্তম্ভ গড়ে তোলেন। এই স্তম্ভ ১৪ মি বর্গাকার, ৩ মি উঁচু বেদীতে স্থাপিত ৩৭ মি উচ্চ এবং ন'টি তল বিশিষ্ট। এককেটি তলার বেড় ৯ মি। এর গঠনশৈলী ও কারুকাজ ভারি সুন্দর। এতে পৌরানিক আখ্যান যেমন আছে তেমনই রয়েছে ধর্মীয় অনুশাসন, আর আরবী ভাষায় খোদিত আল্লার বাণী। এছাড়াও অলঙ্করণে রয়েছে হিন্দু দেবদেবী, হাতি সিংহ ও অন্যান্য বিভিন্ন পশুর মূর্তি প্রভৃতি। ১৫৭ টি সিঁড়ি বেয়ে স্তম্ভের ওপরে উঠলে পাখির চোখে পুরো চিতোরগড় দেখে নেওয়া যায়। তবে আমরা খোলা পাইনি, এখন বন্ধ আছে। বত্রিশ ধাপ উঠে অষ্টম শতকে তৈরি চিতোরেশ্বরী কালীকামাতার মন্দির। কষ্টি পাথরের জাগ্রত মূর্তি। মন্দির তৈরির সময় পুজো হত সূর্যদেবের। আকবরের চিতোর আক্রমনের পর, ১৫৬৮ সালে মন্দির সংস্কারের সঙ্গে দেবতার পরিবর্তন। বাইরের দেওয়ালে দেবতা ও দানবদের সমুদ্র মন্থন, সূর্যদেবতার মূর্তি খোদিত আছে। বড়ী ও ত্রিপোলিয়া গেট পেরিয়ে রানা কুম্ভের প্রাসাদ। যদিও অষ্টম শতকে এটি নির্মাণ করেন বাপ্পাদিত্য, পরে ১৪৩৩ সালে এর আমূল সংস্কার করেন রানা কুম্ভ। রাজপুত স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন এই প্রাসাদ। হাতি, ঘোড়ার আস্তাবল ছাড়া শিব মন্দিরও আছে। প্রত্নতত্ত্ব দপ্তর, নও লক্ষা ভান্ডার ও মিউজিয়াম রয়েছে। ১৯২০ সালে তৈরি ফতেহ প্রকাশ প্যালেস। কেল্লার উত্তরে ১৫৩০ সালে পাথরে তৈরি, রত্নেশ্বর লেকের পাড়ে, রানা রতন সিং-এর প্রাসাদ। মিউজিয়াম লাগোয়া ১৪৪৮ সালে রানা কুম্ভ-র তৈরি কুম্ভশ্যামজীর মন্দির। দেবতা বরাহ অবতাররূপী বিষ্ণু। মন্দিরটি কারুকার্যময়, ছাদ অনেকটা পিরামিডের মতো। কাছেই ১৪৪০ খ্রিস্টাব্দে তৈরি মীরাবাঈ-এর কৃষ্ণমন্দির। দেবতার কোন মূর্তি নেই। নাটমন্দির, জগমোহন ও মূলমন্দির নিয়ে পুরো মন্দির চত্বর। মন্দিরটি যেন কৃষ্ণসাধিকা মীরাবাঈ-এর সরল জীবনের প্রতিচ্ছবি। ১২ শতকে তৈরি জৈন মন্দির শৃঙ্গার চৌরি-র কারুকার্যও খুব সুন্দর। দেবতা ১৬ তম জৈন তীর্থঙ্কর আদিনাথ।

চোদ্দ তারিখ সকালে চিতোর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। লক্ষ্য পুস্কর হয়ে জয়পুর। পথে বেশ কয়েকটা মন্দির দেখলাম। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সোনিজী কী নঁসিয়া। একতলা মন্দিরটির পুরোটাই সোনালী রঙের। কোথাও সোনার জল করা, কোথাওবা সত্যি সোনারই। আমার সেই ছেলেবেলায় পড়া রাজা মিডাসের গল্প মনে পড়ছিল। দেবতার বরে (!) রাজা যাতেই হাত দিতেন তাই সোনা হয়ে যেত। বড় হলঘরে ঝুলনের মত সাজানো গাছপালা, বাড়িঘর, রাস্তাঘাট সবই সোনা রঙে উজ্জ্বল ঝকঝকে,আলো যেন ঠিকরে পড়ছে।

পুষ্কর লেকের ধারে তর্পণরতা বিদেশিনী

হিন্দু-মুসলিম দুই ধর্মেরই তীর্থস্থান পুস্কর। প্রথমে দরগায় ঘুরে এসে তারপরে ব্রহ্মা মন্দির দেখতে ঢুকলাম। প্রাচীন কুণ্ডের ধারে ভারতের একমাত্র ব্রহ্মা মন্দির। বিরাট তোরণদ্বার, যার ওপরে ব্রহ্মার বাহন হাঁসের মূর্তি। তেতাল্লিশ ধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে মন্দির চত্ত্বর। শ্বেতপাথরের মন্দিরটির চূড়া লাল রঙের, অনেকটা মোচাকৃতি । গর্ভমন্দিরে রুপোর সিংহাসনে শ্বেতপাথরের চতুরানন হংসবাহন ব্রহ্মা, বাম পাশে গায়ত্রী দেবী। শাস্ত্রমতে সকল তীর্থের সেরা হিন্দুতীর্থ পুষ্কর। ব্রহ্মার কিন্তু পুজো হয় না। এই নিয়ে পদ্মপুরাণে একটি কাহিনি আছে। কলির প্রভাব থেকে জগৎ সংসারকে বাঁচাতে, স্বর্গের পবিত্র পুষ্করকে মর্ত্যে পাঠাবার মানসে ব্রহ্মা পৃথিবীর উদ্দেশ্যে কলিহীন জায়গার সন্ধানে পদ্মফুল নিক্ষেপ করেন। সেই ফুল পৃথিবী ভ্রমণ করে পুষ্করে তিনজায়গা স্পর্শ করে। সেই তিন জায়গায় জল বেরিয়ে সরোবর তৈরি হয় - বুড়া বা ব্রহ্মা পুষ্কর, মধ্যম বা বিষ্ণু পুষ্কর ও কনিষ্ঠ বা রুদ্র পুষ্কর। ব্রহ্মার মনোস্কামনা পূরণ হল বলে তিনি যজ্ঞ করতে বসেন। বিধিমতে স্ত্রী সহ যজ্ঞ করার প্রথা। স্বর্গের দেবীদের আনতে গিয়ে সাবিত্রীদেবীর দেরী হয়ে যায়। লগ্ন প্রায় পেরিয়ে যাচ্ছে দেখে পুত্র নারদের পরামর্শে গোপবালাকে গরুর দুধে শোধন করে, নামান্তরিত গায়ত্রীদেবীকে গান্ধর্বমতে বিবাহ করে ব্রহ্মা কনিষ্ঠ পুষ্করে যজ্ঞে বসেন। আর ঠিক তখনই সাবিত্রীদেবী যজ্ঞস্থলে এসে পৌঁছান। সব দেখেশুনে, ক্ষুব্ধ ও অপমানিত বোধে তিনি শাপ দিলেন যে এরপর থেকে ব্রহ্মাকে কেউ পুজো করবে না। সেই থেকে কোথাও ব্রহ্মার পুজো হয় না। এমনকী আর কোথাও ব্রহ্মার মন্দিরও নেই। অন্যান্য দেবতাদেরও ব্রহ্মাকে মদত দেওয়ার জন্য অভিশাপ দেন সাবিত্রীদেবী। তারপর শোকে-দুঃখে নিজে পাহাড় চূড়ায় ঠাঁই নিলেন। পাহাড়ের নামও সেই থেকে হয় সাবিত্রী পাহাড়।

ব্রহ্মার মন্দির চত্ত্বরে নানা অন্য মন্দিরও আছে - পাতালেশ্বর, মহাদেব, নারদ, গণেশ, কুবের, সূর্যদেব, সপ্তঋষি ইত্যাদি। কুণ্ডের পাড়ে অন্য এক পাহাড়ে রয়েছে গায়ত্রী মন্দির। কুণ্ডের চারধারে বাহান্নটি ঘাট আছে। এখানে স্নান, তর্পণ ও পারলৌকিক ক্রিয়ায় অক্ষয় ফললাভ হয় বলে স্থানীয় বিশ্বাস। একটি ঘাটে চোখে পড়ল অল্পবয়সী এক বিদেশিনী পুরোহিতের সাহায্যে তর্পণ করছেন।

অম্বর প্যালেস, জয়পুর

জয়পুর পৌঁছলাম রাত ন'টা নাগাদ। পনেরো তারিখ সকালে উঠে বেরিয়ে পড়লাম সারাদিনের জন্য জয়পুর ঘুরতে। প্রথম গন্তব্য অম্বর প্যালেস। এই প্রাসাদও রাজপুত স্থাপত্যের এক অপূর্ব নিদর্শন। সুরয পোল দিয়ে ঢুকে ডানদিকে জালেব চক, কয়েকটা সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠে সিংহ পোল-এর পরে দোতলায় ডানদিকে পাথরের মন্দিরে শিলা মাতা যশোরেশ্বরী বা বাংলার দেবী কালি। এই দেবী সম্পর্কে প্রচলিত ছড়া -

শিলাদেবী নামে
ছিলা তাঁর ধামে
অভয়া যশোরেশ্বরী।

মথুরাতে রাজা কংস, দৈববাণীতে ভীত, দেবকীর সন্তানদের একটি শিলাখণ্ডে আছড়ে মারতেন। সেই শিলাখণ্ডে যোগমায়াকে বধ করলে, অষ্টভূজারূপে দেবীর আবির্ভাব হয়। বাংলার রাজা প্রতাপাদিত্য সেই শিলা থেকে দেবী মূর্তি গড়ে যশোরে প্রতিষ্ঠা করেন। ১৬০৪ সালে মান সিংহ বাংলা জয় করলে, দেবীকে অম্বরে নিয়ে আসেন। পুরোহিতও আসেন বাংলা থেকে। এই দেবী শক্তি সাধনার প্রতীক। সেই সময় দেবীর সামনে মোষ, ছাগল, ভেড়া এমনকী নরবলিও হত। শোনা যায়, রাজা সোয়াই জয় সিংহ নরবলি বন্ধ করায় দেবী রুষ্ট হয়ে বামে মুখ ফিরিয়ে নেন। এখনও সেই রকম আছে। যদিও প্রচলিত কালী মূর্তি থেকে কিছুটা আলাদা - মূর্তির জিভ মুখের বাইরে নেই, পদতলে শিবও নেই, শ্বেতপাথরের এই অষ্টভুজা দেবী মূর্তি কিন্তু খুবই সুন্দর। রুপোর দরজা ও মন্দির কারুকার্যময়। রাজদরবার বা দেওয়ানি আম-এর পুরো হলটাই রাজপুত স্থাপত্যশিল্পের অপূর্ব সমাবেশ। সম্রাট জাহাঙ্গীর নাকি ঈর্ষান্বিত হয়ে এই কারুশিল্পের ওপর আস্তরণ লাগিয়ে দেন। ছাদ দাঁড়িয়ে আছে চল্লিশটি সূক্ষ্ম কারুকার্যময় শ্বেত পাথরের স্তম্ভের ওপর। গণেশ পোলের গেটটি মোজায়েকের অলঙ্করণ ও সুন্দর চিত্রে সাজানো। ওপরে গণেশের মূর্তি। ভেতরে সুন্দর জাফরি দিয়ে তৈরি জেনানা মহল। মাঝে সুন্দর বাগিচার চারপাশ ঘিরে রয়েছে জয় মন্দির, শিশ মহল, যশ মন্দির, সোহাগ মন্দির ও সুখ মন্দির। এরমধ্যে জয় মন্দির হল দেওয়ানি খাস বা রাজার নিজস্ব মন্ত্রণা সভা। এটি মূল্যবান পাথর ও মণি-মানিক্য দিয়ে সাজান, কাঁচের অভিনব মোজাইকও আছে। শিশ মহলের দেওয়াল, ছাদ ও মাঝে বিভিন্ন রঙের কাঁচ ও আয়না দিয়ে সুন্দর করে সাজানো। এটি রাজা প্রথম জয়সিংহের তৈরি। গণেশ পোলের ওপরে সোহাগ মন্দিরে, জানালায় সূক্ষ্ম ও সুন্দর জালির কাজ আছে। এই জানলা দিয়েই রানিরা উৎসবাদি দেখতেন। সুখনিবাসের দরজায় হাতির দাঁত ও চন্দন কাঠের সূক্ষ্ম কারুকার্য। এখানে জানলা দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে, তেমনই মেঝেতে খাঁজ করে শীতল জলপ্রবাহের অভিনব বাতানুকুল ব্যবস্থা। এরপরে রয়েছে প্রথম মান সিংহের মহল, এটিও অনবদ্য। এখানে আছে হাতির দাঁতের কাজ, পাথরের কাজ ও পাথরের ওপর পেন্সিলে আঁকা ছবির অভিনব সংগ্রহ। খাওয়ার ঘরের দেওয়ালে অনেক তীর্থস্থানের ছবি আঁকা আছে। সব শিল্পকর্মই অপূর্ব সুন্দর। এখানে আরও আছে, জগৎ শিরোমণি বা কৃষ্ণ মন্দির ও গরুড় মন্দির। রয়েছে রাজপরিবারের কারুকার্যময় স্মৃতিস্তম্ভ।

পরবর্তী গন্তব্য নাহারগড় বা সুন্দরগড় দুর্গ বা টাইগার ফোর্ট। শহরের ৬.৫ কিমি উ-পূবে ১৮০০ মি উঁচু পাহাড়ের মাথায় ১৭৩৪ সালে রাজা জয়সিং-এর তৈরি দুর্গ। একে শহরের প্রহরীও বলা হয়। এর দুটি তলা মাটির নীচে। দুপুরের খাওয়া সেরে ফেরার পথে চোখে পড়ল জলমহল। ১৭৯৯ সালে মানসাগর হ্রদের মাঝখানে পাঁচতলা এই গ্রীষ্মাবাসটির নির্মাণ করান রাণা প্রতাপ সিং। বর্তমানে এটি একটি বিলাসবহুল হোটেল।

হাওয়া মহল, জয়পুর

ষোল তারিখ সকালে প্রাতরাশ সেরে আবার সারা দিনের জন্য বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে গোবিন্দজির মন্দির। ঔরঙ্গজেবের হাত থেকে রক্ষা করতে ১৮ শতকে সোয়াই জয় সিংহ গোবিন্দজীকে বৃন্দাবন থেকে এনে, জয় নিবাস বাগে সুন্দর কারুকার্যমন্ডিত এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের সিলিং সোনায় অলঙ্কৃত করা আছে। কষ্টিপাথরের অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত দণ্ডায়মান গোবিন্দজী, পূজা পাচ্ছেন বাঙালি পূজারির হাতে। পরবর্তী গন্তব্য সিটি প্যালেস। এই প্রাসাদ চন্দ্রমহল নামেও খ্যাত। জয়পুরের এই প্রাসাদ রীতিমতো ছোটখাট এক শহর। রাজস্থানী ও মুঘল স্থাপত্যে গড়া এই প্রাসাদ পুরী, চারদিক পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। প্রাসাদে মূল প্রবেশ পথ দুটি - একটি পূর্বে - শিরে কি দেওড়ি আর দক্ষিণে ত্রিপোলিয়া দরোয়াজা। শিরে কি দেওড়ি দিয়ে ঢুকে বিধান সভা বা টাউন হল, অফিস কাছারির পরে নক্কর দরোয়াজা, তারপর জালের চক। চকের পর যন্তর মন্তর, সিটি প্যালেস ও হাওয়া মহল। এই প্রাসাদ বা দুর্গ ১৭২৮-৩২, মহারাজা সোয়াই জয় সিংহের হাতে তৈরি হলেও, পরবর্তীকালে বিভিন্ন মহারাজার হাতে নতুন নতুন মহলের সংযোজন হয়েছে। শ্বেতশুভ্র দোতলা মুবারক মহল বা মহারাজার অতিথি ভবন বা গেষ্ট হাউসের শ্বেত মর্মরের কারুকার্য অনবদ্য। দোতলায় রাজপরিবারের পরিধেয় বস্ত্রের মিউজিয়াম। এরপর ক্লক টাওয়ার, সিংহ পোল ও হাতি পোল পেরিয়ে বেলেপাথর ও শ্বেতপাথরের সমন্বয়ে তৈরি দেওয়ানি খাস। বাইরে বিশ্বের বৃহত্তম রুপোর জলাধার দুটিও (প্রায় ৫ ফুট উঁচু ও ৩ ফুট চওড়া) দেখার মত। দেওয়ানি খাসের পর দেওয়ানি আম। এটি তৈরি করেন মহারাজ সোয়াই সিংহ, ১৮ শতকে। সুন্দর সোনালী ও গাঢ় লাল রঙ - অলঙ্কৃত। এখানে মূল্যবান চিত্রের সংগ্রহ ও দুষ্প্রাপ্য পুঁথির সম্ভার আছে। সংগ্রহের মধ্যে ভুর্জপত্রে বাংলায় লেখা মহাভারতও রয়েছে। অস্ত্র-শস্ত্র যে হলঘরে আছে, তা অনবদ্য হয়েছে সোনা ও বেলজিয়াম কাঁচের অলঙ্করণে। গণেশ পোলের পরে প্রিতম নিবাস চক, চকের দুধারে দুধের মত সাদা মার্বেল পাথরের সাততলা চন্দ্রমহল। চন্দ্রমহলের একতলায় অডিয়েন্স হল, দোতলায় ও তিনতলায় সুখনিবাস, চারতলায় রঙ মন্দির ও শোভা নিবাস, পাঁচ ও ছয় তলায় ছবি নিবাস - নানা আকারের আয়নায় সাজানো মিরর প্যালেসও খুব সুন্দর এবং সাততলার মার্বেল প্যাভিলিয়নও অনবদ্য। চন্দ্রমহলের পাশে জেনানা মহল ও আনন্দমহল।

যন্তর মন্তর, জয়পুর

এরপরে গেলাম যন্তর মন্তর-এ। এই যন্তর-মন্তরটি বিশ্বের বৃহত্তম, তৈরি হয়েছে ১৭২৮-৩৪-এ। যদিও বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য কিছুটা ম্লান, তবু আজও নিখুঁতভাবে স্থানীয় সময় (যার সঙ্গে ২৯ মিনিট যোগ করলে ভারতীয় সময় পাওয়া যাবে), সূর্যের অবস্থান, দ্রাঘিমাংশ, অক্ষাংশ, তারকা, উপগ্রহের গতিপথ ইত্যাদি জ্যোতির্বিজ্ঞানের বহু তথ্য, পাথরের তৈরি ১৮ টি জ্যামিতিক যন্ত্রে পাওয়া যায়। তবে গাইডের সাহায্য দরকার। আমাদের পরবর্তী গন্তব্য হাওয়া মহল। সিটি প্যালেস থেকে বেরিয়েই বড় রাস্তার ওপর ত্রিপোলিয়া বাজার, আর তার পাশেই এই হাওয়া মহল বা প্যালেস অফ উইন্ডস। উঁচু ভিতের ওপর গোলাপি রঙের বেলেপাথরের, অনেকটা মোচাকৃতি বা পিরামিডের মত, পাঁচতলা এই প্রাসাদটি জয়পুরের অন্যতম আকর্ষণ। এটি ১৭৯৯-এ মহারাজা সোয়াই প্রতাপ সিংহ তৈরি করান। মূলতঃ রাজমহিষীদের, রাজকীয় শোভাযাত্রা ও জনসাধারণের নিত্য নৈমিত্তিক জীবনযাত্রা দেখার জন্য তৈরি। এটি ৩৬০ টি অর্ধ অষ্টভুজাকার ঝোলানো গবাক্ষ ও ৫৯৩ টি পাথরের পর্দা বিশিষ্ট। একেবারে অন্যরকম গঠনশৈলী, এর জালির কাজ, ছাদ, গম্বুজ সবই বৈচিত্রময়। এতগুলি জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে, যন্ত্র ছাড়াই বাতানুকুল ব্যবস্থা রয়েছে। এবার আজকের শেষ দ্রষ্টব্যস্থল অ্যালবার্ট হল। এটির নাম রামনিবাস বাগ বা আলবার্ট হল বা যাদুঘর। রামনিবাস উদ্যানে ৩৬ একর জমিতে তৈরি ১৮৭৬-এ প্রিন্স অ্যালবার্টের জয়পুর ভ্রমণকে স্মরণীয় করে রাখতে, মহারাজা সোয়াই রাম সিংহ ও মহারাজা সোয়াই সিংহের সময়ে তৈরি হয়। বেলেপাথর ও শ্বেতপাথরের বৈচিত্র্যময় ছাদ, গম্বুজ ও অলিন্দ নিয়ে তৈরি - স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। এখানে আছে মহারাজাদের তৈলচিত্র, নানা চিত্রকলা, বসন-ভূষণ, স্টাফড জীবজন্তু, রাজস্থানী সমাজজীবনের ছবি, হাতির দাঁতের নানা শিল্প, বিশ্বে প্রাচীনতম কার্পেট (১৬৩২ খ্রী), পেতলের কাজের সংগ্রহ। সব দেখে হোটেলে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে নামল। মহারাজাদের সমাধিস্থল, ইন্দোলজি মিউজিয়াম, চিড়িয়াখানা, আর্ট গ্যালারি, ডলস্ মিউজিয়াম, বিড়লা মন্দির, জয়গড় ফোর্ট, শিশোদিয়া বাগ ও প্রাসাদ এমন অনেককিছুই এযাত্রায় দেখা সম্ভব হল না।

১৭ তারিখ সকাল সকাল জয়পুর থেকে বেরিয়ে পৌঁছে গেলাম ১৫৭ কিমি দূরবর্তী সোয়াই মাধোপুরে। পরেরদিন এখান থেকেই ১৪ কিমি দূরে রণথম্বর জাতীয় উদ্যানে জঙ্গল সাফারি। এদিনটা সেইসব ব্যবস্থা ঠিক করে আর ছোট্ট শহরটায় ঘুরে বেড়িয়েই কেটে গেল। পরদিন ভোরে উঠে ফরেস্ট অফিসের নির্দেশ মত আগের দিন ঠিক করে রাখা অটোয় চড়ে ফরেস্ট অফিসে পৌঁছলাম। সেখানকার নিয়মকানুন মিটিয়ে ছাদ আর চারপাশখোলা একটা বাস - স্থানীয় নাম ক্যান্টর-এ চেপে বসলাম। ক্যান্টরের মোট চোদ্দ জন যাত্রীর মধ্যে আমরা ছাড়া সকলেই বিদেশি। এই রকম অনেকগুলো ক্যান্টর ছাড়াও ছ'জন যাত্রীর জিপও ছিল বেশ কয়েকটা। যাইহোক সকাল ছ'টা নাগাদ বাস ছাড়ল। মিনিট পনের-কুড়ি বাদে আমাদের ক্যান্টর একটা জিপের পাশে গিয়ে থামল। চারিদিকে ফিসফিস - নাকি বাঘ দেখা যাচ্ছে - আমরাও বেশ উত্তেজিত। জিপের গাইড ইশারায় বাঁদিকে দেখতে বললেন। আমরাও প্রাণপণে চোখগুলোকে ফোকাস করার চেষ্টা করলাম। কেউ দেখতে পেল কেউবা পেলনা। ওরই মধ্যে একজন একটু জোরে বলে উঠলেন, 'কই বাঘ?' আরেকজন বললেন, "ওই তো সোজা ওয়াই-এর মত যে গাছটা দেখা যাচ্ছে তার নীচে বসে আছে"। আর একজন বললেন, "ওই তো বাঘ মাথা নাড়ল।" তারপর এক সহযাত্রী তাঁর দূরবীন দিয়ে দেখে বাঘের উপস্থিতি নিশ্চিত করলে সকলে চুপ করলেন। দূরবীনটা হাতে হাতে ঘুরতে লাগল। দূরে হোক তবু তো বাঘ দেখা - এতেই অনেকে খুশি। খানিকবাদে বাঘ উঠে জঙ্গলের অন্যদিকে ঢুকে গেলে আমাদের গাড়িও পিছু পিছু চলতে লাগল যদি আবার তাকে দেখা যায় সেই আশায়। কিন্তু তার আর দেখা না মিললেও হরিণ ও নীলগাই দেখতে পেলাম। অরণ্যে নানা ধরণের পাখিও ছিল। একজায়গায় অনেক পাখির দেখা মিলল একসঙ্গে। সাদা-খয়েরি রঙের মাঝারি মাপের একটা পাখি বারবার উড়ে এসে আমাদের হাত থেকে খাবার নিয়ে যাচ্ছিল। সেটা বেশ মজাই লাগছিল!

অনেক দেখা আর না দেখায় রাজস্থান ভ্রমণ শেষ হল। রয়ে গেল অপূর্ব সব স্মৃতি মনের মণিকোঠায়।

রণথম্ভোর ন্যাশনাল পার্ক

~ রাজস্থানের তথ্য ~ রাজস্থানের আরও ছবি ~

রেলের চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার দীর্ঘদিন পরও উনআশি বছরের তরুণ দেবাশিস বোসের একটা বড় সময় কাটে ভ্রমণেই।

কেমন লাগল : - select -

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

মহাপ্রস্থানের পথে

সুজয় গোস্বামী

সতোপন্থ তাল ট্রেক রুট ম্যাপ ~ ট্রেকের আরও ছবি

কলকাতা থেকে ১৮ই মে, ২০১৩ দুন এক্সপ্রেসে রওনা হলাম হরিদ্বারের উদ্দেশ্যে। সেখান থেকে বদ্রীনাথ হয়ে যাব তিব্বত সীমান্তে ভারতের শেষ গ্রাম "মানা"। মানা থেকেই শুরু হবে আমাদের মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা, অর্থাৎ সতোপন্থ তাল ট্রেক।

হরিদ্বার থেকে আমাদের প্রথম দিনের লক্ষ্য ছিল যোশীমঠ, কারণ সতোপন্থ তাল ট্রেকের জন্য ওখান থেকেই ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের পারমিট নিতে হয়। কিন্তু যথারীতি দুন এক্সপ্রেসের বদান্যতায় আমাদের প্রথম দিনের দৌড় চামোলিতেই শেষ হল। চামোলি বাসস্ট্যান্ডে অত্যন্ত সস্তা এবং সুন্দর কেদার বদ্রী মন্দির কমিটির অতিথিশালায় রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে যখন যোশিমঠের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছি, অতিথিশালার ম্যানেজার কথা প্রসঙ্গে জানালেন, যোশিমঠে কিছুই করতে হবে না; তাঁর এক ভাই মানায় লোকাল গাইড, তাকে তিনি ফোন করে দেবেন, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ভদ্রলোকের কথায় এমন একটা জোর ছিল যে আমরা রাজি হয়ে গেলাম।

দুপুর একটা নাগাদ মানা পৌঁছে সেই 'লোকাল গাইড' মহাশয়ের কাছে আমাদের পরিকল্পনা ব্যক্ত করতে তিনি কিছুটা নেতিবাচক ভঙ্গিতেই সাফ জানিয়ে দিলেন পোর্টার পড়বে ১২০০ টাকা দিনপ্রতি আর গাইড ২০০০ টাকা। আমি কোনদিন এতটা ধাক্কা খাইনি, আর আমার একমাত্র ট্রেকসঙ্গীটির মুখেও স্পষ্ট হতাশার ছাপ। বলেই দিলাম আমরা পারবনা, বরং ফিরেই যাই। এমতাবস্থায় কী মনে হল, ভদ্রলোক বললেন, আসুন দেখি এখানে একজন 'ট্রেইন্ড গাইড' আছেন, তিনি যদি কোন ব্যবস্থা করতে পারেন।

মাস দুয়েক আগে ইন্টারনেটে সতোপন্থ সম্বন্ধে খোঁজখবর করতে গিয়ে মন্নু সিং রাওয়াত নামে একজন গাইডের সন্ধান পাই। তখন তাঁর রেটটা খুব বেশি মনে হয়েছিল। ভাগ্যের ফেরে সেই মন্নুজির সঙ্গেই আমাদের মোলাকাত হল। তিনি তো কোনমতেই আমাদের সাহায্য করতে রাজি নন। ফাইল খুলে দেখাতে শুরু করলেন সতোপন্থ তাল ট্রেকের পারমিট সংক্রান্ত হাজার ফ্যাকড়া, আর আমাদের হাতে সময় নেই। আমারও রোখ চেপে গেল। এতদূর যখন এসেছি ট্রেক না করে ফিরে যাব না। বেশ কিছুক্ষণ বাকবিতণ্ডার পরে এবং আমাদের পুরোদস্তুর সাজ-সরঞ্জাম দেখে হঠাৎ মন্নুজি বললেন, ঠিক আছে আমি পোর্টার গাইড দেব, রেট ওই ৬০০/- আর ৮০০/-ই থাকবে, কিন্তু আপনাদের বণ্ড দিয়ে যেতে হবে, কারণ এই মরসুমে আপনারাই প্রথম গ্রুপের ট্রেকার, বরফ খুব বেশি আর রাস্তাও বিপজ্জনক। আর আমাদের পায় কে! শুধু প্রকাশ্যে নাচাটাই বাকি রেখে শুরু করে দিলাম ফর্ম ফিলাপ। এরপর ঘুরেফিরে পারমিটের কথা উঠতে মন্নুসিং একটা চওড়া হাসি দিয়ে বললেন, "ম্যায় হুঁ না" । সেদিন থেকে গেলাম মন্নুসিং-এর বাড়িতেই। বিকেলবেলায় এক বছর-চব্বিশের সুদর্শন যুবক এসে নিজের পরিচয় জানাল, সে জগদীশ – আমাদের গাইড।

২২শে মে সকাল ৭টা - মন্নুসিং এর নজর সর্বত্র। এর মধ্যেই তিনি আমাদের পথচলতি কেরোসিন, গাইড-পোর্টারের জন্য ম্যাট্রেস, স্লিপিং ব্যাগ, সানগ্লাস, আইস অ্যাক্স – সব গুছিয়ে দিলেন। প্রায় সকাল ৮টায় আমাদের যাত্রা শুরু হল।

মানা গ্রাম থেকে সতোপন্থ তালের দূরত্ব প্রায় ৩০ কিমি, উচ্চতা ১৪,০০০ ফুটের কিছু বেশি। আমরা যারা বেশিরভাগ সিকিম হিমালয়ে ট্রেক করি তাদের কাছে ১৪,০০০ ফুট আর গাড়োয়ালের ১৪,০০০ ফুটের মধ্যে বেশ খানিকটা ভৌগোলিক পার্থক্য চোখে পড়ে। সেটা কিছুটা অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশের তারতম্যের জন্য আর অনেকটাই পূর্ব হিমালয়ে শিবালিক পর্বতমালার অনুপস্থিতির কারণে।

আজ আমাদের গন্তব্য লক্ষ্মীবন, মানা থেকে প্রায় ৮ কিমি দূরে। মন্নুসিং নিজেই আমাদের ভীমপুল পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। এই রাস্তা তীর্থযাত্রীর ভিড়ে ভারাক্রান্ত। মহাভারতের কাহিনি অনুসারে সতোপন্থ তালের এই পথ আসলে পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থানের পথ। এই পথেরই বিভিন্ন স্থানে দ্রৌপদী এবং চার পাণ্ডব একে একে দেহত্যাগ করেন। অবশেষে সতোপন্থ তালের ধারে স্বর্গারোহিণী হিমবাহের পাদদেশে যুধিষ্ঠিরের জন্য স্বর্গের রথ নেমে আসে। স্থানীয় মানুষের আরও বিশ্বাস - ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর – এই ত্রিমূর্তি বছরের একটি বিশেষ সময়ে সতোপন্থ তালের তিন প্রান্তে অবগাহন করতে আসেন। ভীমপুলের পর তীর্থযাত্রীর ভিড় হাল্কা হয়ে এলেও দু'এক জন সাধু সন্ন্যাসীকে দেখলাম আমাদের পথেই হাঁটতে।

হাঁটা শুরুর প্রায় ঘণ্টাখানেক পর দেখি পথের বাঁ দিকে প্রায় ৪০০ মিটার লম্বা এবং প্রবল চড়াই - এক বিশাল গ্লেসিয়ার, যা আসলে নারায়ণ পর্বতের হিমবাহ, অলকানন্দায় এসে মিশেছে। জগদীশ জানাল আমাদের ওই আইস ব্রিজ পার করে ওপারে যেতে হবে। ব্রিজের নীচ দিয়ে প্রবল গর্জনে বয়ে চলেছে অলকানন্দা। দুরু দুরু বক্ষে গ্লেসিয়ারে পা রাখলাম। বরফ বেশ শক্ত, হড়কালেই সোজা অলকানন্দায়। তাই বেশ জোরেই জুতোর কিনারা দিয়ে পা ঠুকছিলাম। বরফের চড়াই ভেঙে ওপরে পৌঁছে চোখ জুড়িয়ে গেল – একটা ছোট্ট বুগিয়াল। সবুজ ঘাসের মধ্যে একটা দুটো করে রঙিন ঘাসফুল সবে মাথা চাড়া দিতে শুরু করেছে – সামনে দূরে উঁকি দিচ্ছে 'চৌখাম্বা ফোর'।

কিছুক্ষণ চামতোলিতে বিশ্রাম নিয়ে আবার এগিয়ে চললাম আমাদের প্রথম ক্যাম্প লক্ষ্মীবনের দিকে – দূরত্ব প্রায় ৩ কিমি। পুরো পথটাই প্রবল বোল্ডার জোন আর জমাট গ্লেসিয়ারে ভর্তি। গ্লেসিয়ারগুলো ছোট ছোট কিন্তু খুবই খাড়া আর পতন হলেই সোজা অলকানন্দার আহ্বান, ফলে জায়গায় জায়গায় স্টেপ কাটতে হচ্ছিল। বেলা দুটো নাগাদ এসে পৌঁছলাম লক্ষ্মীবন। মানা থেকে সতোপন্থ তাল পর্যন্ত প্রথম এবং শেষ গাছের (বৃক্ষ) দেখা মেলে এই লক্ষ্মীবনেই এবং সেগুলি ভূর্জপত্রের গাছ। পুরাণ অনুসারে এই গাছের বাকলেই ব্যাসদেবের

কথনে গণেশ মহাভারত রচনা করেছিলেন। লক্ষ্মীবনের ক্যাম্পগ্রাউণ্ডটাও ভারি সুন্দর। একদিকে গগনচুম্বী পর্বত, অপরদিকে অলকানন্দা এখানে সুবিস্তৃত। পুরো ক্যাম্পগ্রাউণ্ড জুড়েই সরু সরু জলের ধারা। ক্যাম্পসাইট থেকে ভূর্জপত্রের বনে যাওয়ার পথ প্রায় পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি উৎরাই। সদ্য বরফ গলার কারণে মাটি ভিজে এবং পিচ্ছিল। পথে কয়েকটা প্রমাণ সাইজ বোল্ডার দেখে তাতে হাত-পা মকশ করার লোভ সামলানো গেল না। উল্টোদিকে একটা অনামা গ্লেসিয়ার নেমে এসেছে অলকানন্দাকে পুষ্ট করার জন্য আর তার পেছনে একগুচ্ছ সূচীমুখ পর্বতশৃঙ্গ - স্থানীয় বিশ্বাসে কুবের বা যক্ষের পুরী। সূর্যের আলো পড়ে আসতেই লক্ষ্মীবনের উচ্চতা ঠাণ্ডার জানান দিতে লাগল। টেন্টে ফিরে এলাম। এখানে সূর্য ডোবে প্রায় সাতটা নাগাদ, তার আগে খেয়ে নেওয়াই দস্তুর, কারণ আগুন জ্বালানোর কোন ব্যবস্থা নেই। রাতে ঘুম ভাল হল না, চতুর্দিকে গ্লেসিয়ার ভাঙার শব্দ।

সকালে লক্ষ্মীবনের আরেক রূপ! পুবের আলো সোজা পড়েছে চৌখাম্বা ফোর-এ, আর শেষনাগ পাহাড়ের ওপর কুণ্ডলীকৃত মেঘের দৃশ্য দেখে মনে হচ্ছে কেউ যেন সদ্য উনুন ধরিয়েছে। আটটা নাগাদ হাঁটা শুরু হল এক প্রাণান্তকর বোল্ডার জোন দিয়ে। আজ (২৩/০৫/২০১৩) আমরা লক্ষ্মীবন থেকে ৩ কিমি দূরে বলপাটি হয়ে যাব চক্রতীর্থ, পথে পড়বে সহস্রধারা, নীলকণ্ঠ বেসক্যাম্প, পার্বতীকুণ্ড আর ডানদিক বরাবর চলবে অলকাপুরি গ্লেসিয়ার। বলপাটিতেও দুটো গুহা আছে, একটা বেশ বড়ো, বসবাসযোগ্য, অপরটার ভেতরে-বাইরে আপাততঃ কয়েক ফুট বরফের চাদর। বলপাটি থেকে এক কিলোমিটার যেতেই শুরু হল অনন্ত হিমানি সাম্রাজ্য। বাঁদিকে পড়ল সহস্রধারা। এখানে পাহাড়ের গা বেয়ে অগুনতি জলের ধারা নেমে এসেছে বলে এই নাম, তবে এখন অধিকাংশই জমে রয়েছে।

প্রাণান্তকর চড়াইয়ে ঘণ্টাখানেক যুদ্ধের পর অবশেষে পার হলাম সহস্রধারা। ডানদিকে দেখা যাচ্ছে অলকাপুরি গ্লেসিয়ারের স্নাউট (অলকানন্দা নদীর উৎস), আর বাঁদিকে দূরে প্রথম দেখা গেল নীলকণ্ঠ, তার পাশে পার্বতী। বদ্রীনাথ থেকে নীলকণ্ঠ পর্বতের যে ক্লাসিকাল রূপ দেখতে আমরা অভ্যস্ত, এখানে কিন্তু তা সম্পূর্ণ অন্যরকম; আসলে আমরা এখন চলে এসেছি নীলকণ্ঠের ঠিক উল্টোদিকে। এখান থেকে আমাদের আজকের লক্ষ্য চক্রতীর্থ আরও প্রায় ৮ কিমি দূরে। পুরোটাই যেতে হবে বরফ ভেঙে। মাঝে মাঝে কয়েকটা বিক্ষিপ্ত পাথর সমুদ্রের বুকে দ্বীপের মত মাথা তুলে রয়েছে, সেখানে উঠে উঠে জুতোর বরফ ঝাড়ছি। আমাদের পরবর্তী গন্তব্য নীলকণ্ঠ বেসক্যাম্প, পথে বাঁদিকে পড়ল জমাট বেঁধে যাওয়া পার্বতীকুণ্ড। আমরা বরফ ছেড়ে উঠে এলাম ডানদিকে পাথুরে রিজের মাথায়। নীলকণ্ঠ বেসক্যাম্পের নীচে পৌঁছলাম তখন বেলা একটা।

এবার পথ বেশ বিপদসঙ্কুল। পুরোটাই অ্যাভালাঞ্চ জোন। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উপরের আইস শেরাক ফাটার সম্ভাবনা বাড়তে থাকে। আমাদের দ্বিতীয় দিনের ক্যাম্প আরও ৩ কিমি। পায়ের নীচে বরফের তলায় কুল কুল করে জল যাওয়ার আওয়াজ আর দূরে পাহাড়ে পটকা ফাটার মত অ্যাভালাঞ্চের গর্জন। যখন চক্রতীর্থ দেখতে পেলাম ঘড়িতে সোয়া তিনটে বাজে। তিন-চারশো মিটার খাড়া বরফের ঢাল দিয়ে নেমে একটা বাটির মত জায়গা। কিন্তু টেন্ট পিচ করব কোথায়? পুরোটাই তো দেখি গ্লেসিয়ারের দখলে! হাঁটতে আর ইচ্ছে করছিল না, তাই বসে স্লাইড করে নেমে গেলাম (স্যাকের তলাটা ফাটল)। চতুর্দিকে উঁচু পাহাড়ে ঘেরা এই চক্রতীর্থ সম্বন্ধেও পৌরাণিক কাহিনি প্রচলিত আছে যে শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে একদা তাঁর সুদর্শন চক্রটি রেখে বিশ্রাম নিয়েছিলেন - সেজন্যই স্থানটির এমন অদ্ভুত আকৃতি এবং এই 'চক্রতীর্থ' নাম। গ্লেসিয়ারের পাশে দু'একটা ব্রাউন প্যাচ, তার মধ্যেই একটা মোটামুটি কম ঢালযুক্ত জায়গায় টেন্ট পিচ করলাম। আমাদের পরিকল্পনা ছিল সতোপন্থ তালের ধারে এক রাত থেকে পরদিন স্বর্গারোহিণী আইসফলের দিকে এগিয়ে যাওয়া। কিন্তু আমাদের পোর্টার জানাল সে চক্রতীর্থের চড়াই মাল নিয়ে উঠতে পারবে না। কথাটা শুনে ভাল করে নজর করে দেখি "ওরে বাবা"! কিলোমিটার খানেক দূরে একটা প্রকাণ্ড প্রাচীর দেখা যাচ্ছে, তার ঢাল প্রায় ষাট ডিগ্রি, আর পুরোটাই পা হড়কানো শক্ত বরফে ঢাকা। অগত্যা চক্রতীর্থকে বেস করে সতোপন্থ দেখে ফিরে আসব এই সিদ্ধান্ত হল।

ক্রমে সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়তে শুরু করল আর শুরু হল তুষারে রঙের খেলা। সারাদিনের ক্লান্তির পর চোখ তুলে চারপাশে তাকিয়ে মোহিত হয়ে গেলাম। চক্রতীর্থের মত এমন সুন্দর জায়গায় রাত কাটানো প্রত্যেক ট্রেকারের স্বপ্ন। প্রায় ১৫,০০০ ফুট উচ্চতায় এই বাটির মত জায়গাটার চতুর্দিক ঘিরে রয়েছে নামী - অনামী অনেক তুষারশৃঙ্গ। গ্রাউণ্ডের অধিকাংশটাই তুষারাবৃত, আর আমাদের টেন্টের কয়েক ফুটের মধ্য দিয়ে গ্লেসিয়ার গলা একটা ছোট নালা কুলুকুলু শব্দে বয়ে চলেছে। চোখের সামনেই তাপমাত্রা নামার সাথে সাথে নালার উপরিভাগ জমে ভারগ্লাস হয়ে গেল। কতগুলো নাম না জানা ছোট্ট পাখি বরফের বুকে জেগে থাকা পাথরে কেমোফ্লেজ করে লুকোচুরি খেলতে খেলতে যখন বাস্তবিকই দৃষ্টির অগোচর হল তখন হুঁশ ফিরল সত্যিই সন্ধে হয়েছে। রাতে যথারীতি সেই গ্লেসিয়ার ভাঙার আওয়াজ। মাঝরাতে একবার টেন্টের বাইরে মাথা বের করে চমকে গেলাম - অদূরে তুষারাবৃত প্রান্তর আর চারপাশের তুষারশৃঙ্গে জ্যোৎস্নার প্রতিফলন এক অতিপ্রাকৃত পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। গা ছমছম করে উঠল। ফের স্লিপিং ব্যাগের আশ্রয়ে ফিরে এলাম।

পরদিন (২৪/০৫/১৩) ভোর সাড়ে পাঁচটায় টেন্ট থেকে বাইরে উঁকি দিয়ে মাথা ঘুরে গেল। এরকম তিনশ ষাট ডিগ্রি জুড়ে সূর্যোদয়ের রঙ দেখার সৌভাগ্য কখনও হয়নি। পশ্চিম থেকে পুবে বালাকুন, চৌখাম্বা, নীলকণ্ঠ এবং আরও ছোট বড় চুড়োতে একে একে রঙ ধরছে আর তার প্রতিফলন হচ্ছে সামনে জমে থাকা জলের ধারায়। লাল থেকে সোনালি, সোনালি থেকে সাদা - পাগলের মত শাটার টিপেই চলেছি, এমন সময়, "স্যার কফি" - জগদীশ হাজির। ছোকরা আমাদের ট্রেক করা ছাড়া আর কিছুই করতে দেবে না প্ল্যান করে রেখেছে। কফি খেতে খেতে দূরের প্রাচীর সদৃশ চড়াইটা দেখছি আর বেশ ভয় পাচ্ছি, তখন আমাদের পোর্টার লাকিবাবু আমার কাছে একটা সাবান চাইলেন। তিনি নাকি ক্যাম্প ম্যানেজার হয়ে বসে থাকবেন আর ওই বরফ গলা জলে চান করবেন!

আটটা নাগাদ তিন মূর্তি রওনা হলাম সতোপন্থের উদ্দেশ্যে। একটু এগোতেই চোখে পড়ল পাশাপাশি দুটো গুহা যেখানে গতরাতে দুই সাধুবাবা আশ্রয় নিয়েছিলেন। গুহাগুলো পিছনে ফেলে এগিয়ে চললাম প্রাণান্তকর বরফাবৃত চড়াইয়ের দিকে। প্রায় ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় রিজে পৌঁছে দেখি বিশ্রাম নেব কী! সেখানে পাশাপাশি দু'পা রেখে দাঁড়ানোরই জায়গা নেই। কোনোমতে ঘোড়ায় চড়ার মত করে বসে দেখি অপর দিকেও খাড়া ঢাল এবং প্রবল ঝুরো মাটি… তারপর বিস্তীর্ণ প্রান্তর… পুরোটাই তুষারাবৃত। তিনদিকে ঘিরে রয়েছে নীলকণ্ঠ, চৌখাম্বা, বালাকুন শৃঙ্গ; আর এদের থেকে নেমে আসা গ্লেসিয়ার একত্রিত হয়ে পুষ্ট করছে মূল অলকাপুরি গ্লেসিয়ারকে। ওপারে নামতেই শুরু হল এক নতুন উৎপাত- 'রক-ফল জোন'। দুরুদুরু বুকে এক দমে জায়গাটা পার হওয়ার পর জগদীশ আমাদের দেখাল দূরে আরও একটা তরোয়ালের মত ধারালো রিজের মাথায় একটা লাল পতাকা পত্‌পত্‌ করে উড়ছে। আমাদের গন্তব্য আগতপ্রায়। আসলে প্রকৃতিই এই জায়গাগুলোকে নিজের মত করে রক্ষাকবচ দিয়ে ঘিরে রেখেছে। সরু ঝুরো রাস্তায় ক্যাটওয়াক করে অবশেষে দেখা মিলল সতোপন্থ তালের। বিভিন্ন ভ্রমণ পত্রিকায় ত্রিভুজাকৃতি সতোপন্থ তালের যে পান্নাসবুজ রূপ দেখে আমাদের ট্রেকের পরিকল্পনা শুরু,

সেই প্রচলিত ছবির সাথে আজকের দেখা তালের অনেক ফারাক। এখন লেকের চারপাশ তো বটেই, এমনকি জলেরও সত্তর ভাগ জমে বরফ। সাদার চালচিত্রে একচিলতে সবুজ জল যেন আরও বর্ণময় হয়েছে। ছবিতে দেখা মানা গ্রাম পঞ্চায়েতের তৈরি লেকের ধারের একমাত্র আস্তানাটিও বরফের তলায়। তালের উপরের দিকে দু'টি গুহার একটিতে দেখি এক সুইস তান্ত্রিক আস্তানা গেড়েছেন, অপরটির মালিকানা রহস্যময়... তবে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য মজুত আছে।

রিজ ধরে স্বর্গারোহিণী আইসফলের দিকে কিছুটা এগিয়ে দেখি গ্লেসিয়ার নিজেই তাল পর্যন্ত চলে এসেছে, ফলে দুঃখ আরও কমে গেল। জগদীশের তাড়া সত্ত্বেও আমাদের ফটোগ্রাফির ঠেলায় রওনা হতে প্রায় বেলা একটা বাজল। প্রবল ঝুরো উৎরাই ভেঙে চলেছি এমন সময় আকাশ কাঁপিয়ে বাজ পড়ার মত শব্দে সভয়ে তাকিয়ে দেখি নীলকণ্ঠের আইসক্যাপ থেকে অ্যাভালাঞ্চ নেমে আসছে। আমাদের রাস্তা থেকে শ'তিনেক মিটার দূর দিয়ে তিনি পার হলেন; বুঝলাম জগদীশের তাড়ার কারণ। রোদের তেজ বাড়ার দরুণ বরফের উপরিভাগ পিছল হয়ে ক্রমাগত পা হড়কাতে লাগল। অবশেষে আবার সেই তরোয়ালের মত গিরিশিরায় সওয়ার হয়ে তিনশ ষাট ডিগ্রি দর্শন এবং বিশ্রাম।

ফেরার সময় লক্ষ্য করলাম পথের দু'ধারে প্রচুর বেগুনি হলুদ ঘাসফুল ফুটেছে। সকালে ওদের দেখেছি বলে তো মনে পড়ল না, তবে কি সতোপন্থ তাল ঘুরে আসার জন্য প্রকৃতি তার নিজ পদ্ধতিতে স্বাগত জানাল? দূরে দেখা যাচ্ছে আমাদের টেন্ট, আর সামনের গ্লেসিয়ারের গলা জলে ছায়া পড়ছে কুবের পর্বতের। মনটা এক অদ্ভুত প্রশান্তিতে ভরে গেল।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কিভাবে যাবেনঃ হরিদ্বার থেকে বাসে বা গাড়িতে যোশিমঠ (যোশিমঠের শেষ বাস হরিদ্বার থেকে ভোর সাড়ে ৫টার মধ্যে ছেড়ে যায়)। যোশিমঠে পারমিট করিয়ে গাড়িতে বদ্রীনাথ হয়ে মানা গ্রাম।

পারমিটঃ সতোপন্থ তাল যেতে এখন আর ইনারলাইন পারমিট লাগে না। যোশিমঠের ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্ট থেকে ট্রেকের পারমিট করাতে হয় উপযুক্ত পরিচয়পত্র ও পাসপোর্ট সাইজ ছবি দিয়ে। যোশিমঠে না থেমেও সরাসরি মানা চলে যাওয়া যায়; সেক্ষেত্রে আগে থাকতে পারমিট করিয়ে রাখা যায় মানা গ্রামের মন্নু সিং রাওয়াতের মাধ্যমে। বিশদ বিবরণ- M. Hill Adventures, Ph # 09412966171, 0955764463

পোর্টার-গাইডঃ এজন্য মন্নু সিং রাওয়াতের সঙ্গে যোগাযোগ করাই ভাল, কারণ এই অঞ্চলে পোর্টার-গাইডের রেট অস্বাভাবিক বেশি।

আদর্শ সময়ঃ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর যাওয়ার জন্য ভাল সময়। তবে তুষারের সৌন্দর্য পেতে হলে মে-জুনে যেতে হবে।

মনে রাখা ভালঃ পথে অধিকাংশ পড়াও-এ প্রাকৃতিক গুহা থাকলেও টেন্ট নেওয়াই সমীচীন, কারণ একাধিক দল গেলে স্থান সঙ্কুলান হওয়া মুশকিল।

সতোপন্থ তাল ট্রেক রুট ম্যাপ ~ ট্রেকের আরও ছবি

পেশায় ব্যবসায়ী সুজয় গোস্বামী পাহাড় আর অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় বেরিয়ে পড়েন যখন তখন।

tell a Friend

সমুদ্রকন্যা লাক্ষাদ্বীপ

শ্রাবণী দাশগুপ্ত

~ লাক্ষাদ্বীপের তথ্য ~ লাক্ষাদ্বীপের আরও ছবি ~

প্রস্তুতি

ভারতবর্ষের মানচিত্রের মোটামুটি দক্ষিণ পশ্চিমে লক্ষ হীরার মত লক্ষ দ্বীপ... আমরা বলি লাক্ষাদ্বীপ। আরবসাগরের নোনাজলের বুকে ভেসে থাকা এই দ্বীপের সংখ্যা কিন্তু সাকুল্যে সাঁইত্রিশ! প্রাচীন ও মধ্য যুগের কিছু নাবিকদের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়েছিল এই দ্বীপপুঞ্জের। কিন্তু সংখ্যাটি সঠিক না জানার দরুণ লোকমুখে দাঁড়িয়েছিল লক্ষাধিক। কেরালার রাজকুলের সঙ্গে আরব বনিকদের জলবাণিজ্যসূত্রে খবর পাওয়া গিয়েছিল কয়েকটির। তারপর নারকেল চাষ ও বসতি গড়ে ওঠা। ঠিক হয়েছিল পুজোয় লাক্ষাদ্বীপ। শরতের দুপুরে পৌঁছে গেলাম কেরালার কোচি বিমানবন্দরে।

উড়ান

পরদিন কোচি বিমানবন্দর থেকে সকাল দশটায় আমাদের উড়ান। ঝকঝকে ছিমছাম বিমানবন্দর। শোনা গেল লাক্ষাদ্বীপ যাবার বিমানের আসন সংখ্যা মাত্র ষোল! উত্তেজনায় টগবগ করছিলাম... সত্যি যাচ্ছি তা হলে, সত্যিই!
প্লেন ছাড়ার কিছু আগে কফিপান করছিলাম। হঠাত পেছন থেকে শুনলাম 'অমায়িক' কেউ ভাঙা বাঙলায় বলছে, "আজ আর প্লেন উড়বে না ম্যাডাম।" ফিরে দেখলাম জাঁদরেল চেহারা, দরাজ গলার মালিককে। আগে দেখেছি বলে মনে পড়লো না। কফি শেষ করে প্রতীক্ষা করছিলাম। এখানে ভিড় ও ব্যস্ততা দুইই কম। কাচের দরজার মধ্যে দিয়ে অপেক্ষমান বিমানদের দেখা যাচ্ছিল। রানওয়েতে খানিকটা দূরে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের খেলনা যান। একসময়ে নির্দেশ এলো আমাদের জন্যে। হাতব্যাগ বগলদাবা করে লাইন দিলাম ওঠার জন্যে। এবারে "হাই" বললেন এক ফরাসি কন্যে। সঙ্গে পুরুষটি (স্বামী বা বন্ধু) অতি সুদর্শন, দীর্ঘকায়, গৌরাঙ্গ। মাথায় লম্বা হ্যাট, পরিধানে বারমুডা ও সুতির গেঞ্জি। মেয়েটির পোষাকও সমগোত্রীয়।
সাকুল্যে এগারোজন যাত্রী নিয়ে আকাশে উড়লো আমাদের জাহাজ। গন্তব্য আগাট্টি, লাক্ষাদ্বীপের একমাত্র দ্বীপ, যেখানে আছে বিমানবন্দর। রাজধানী কাভারত্তির সঙ্গে সংযোগের উপায় জাহাজ কিম্বা হেলিকপ্টার। সেখানে এয়ারপোর্ট নেই। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, দরাজ গলা এবং দশাশই চেহারার সেই প্রৌঢ় এসে বসলেন ককপিটে। আলাপী মানুষ, অভিজ্ঞতায় ও আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। আমরা ক্রমশঃ অনেক উঁচুতে। কন্যা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল নীচে। ছোট্ট জানালার মধ্যে দিয়ে বিরাট দর্শন হয়ে গেল। দেখলাম, প্রকৃতির দুনিয়ায় কোনো বিবাদ নেই, বিভেদ নেই, বর্ণ-ধর্ম-জাতিভেদ এসব কিছুই নেই! দিব্যি সুন্দর সহাবস্থানে চঞ্চল উচ্ছল নীলচে-সবুজ আরবসাগর আর শান্ত, গভীর গম্ভীর নীল ভারত মহাসাগর। মাঝে কোনো বিচ্ছিন্নতার রেখা টানা নেই। তাই পৃথিবীর রাজনৈতিক আর ভৌগোলিক মানচিত্র পুরো আলাদা। একটি আমাদের স্বার্থপর ঈর্ষাকাতর ভাগাভাগির শিকার আর অপরটি প্রকৃতির পরম যত্নে, কোমলতায় সস্নেহ রচনা। ক্রমশঃ স্পষ্টতর হচ্ছিল সবুজ-সাদায় মেশা সে দ্বীপ। আগাট্টির ছোট্ট এয়ারপোর্টে নামলাম আমরা। বিচ-রিসর্টের দু'জন কর্মী সসম্মানে গ্রহণ করলেন অতিথিদের।

বেলাভূমে

বেলা প্রায় সাড়ে এগারো। আগাট্টি বিচ রিসর্টের কর্মীরা আতিথেয়তা করলেন প্রত্যেককে কচি ডাব দিয়ে। মিষ্টি জল মুহূর্তে আমাদের তৃষ্ণাহরণ করল। রিসেপশন-কক্ষ কংক্রিটের নয়। নারকেল পাতায় ছাদ ও দেওয়াল, শুধু লাল সিমেন্টের মেঝেটুকু। বড় আরাম লাগল তার আপন করা স্নিগ্ধতা। খাতা খুলে নামধাম মিলিয়ে নিলেন ম্যানেজার। নিয়মরক্ষার কাজ শেষ করে মালপত্র নিয়ে এবার সংরক্ষিত কটেজের দিকে এগোলাম। রিসেপশন পেরিয়েই বিশাল ডাইনিংরুম। সাদা বালিতে পা বসে যাচ্ছে, পদক্ষেপ শ্লথ। ঘরের কাছে এসে দেখি, অস্থায়ী কুটির যেন আলগা করে তটভূমির ওপরে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। চারপাশে সাদা নুনের মত বালি আর অদূরেই সমুদ্রের নীলাভ সবুজ রেখা। আরও অনেকগুলি এইরকমের ঘর ইতস্তত ছড়ানো রয়েছে। সেগুলোর মাঝে নানা উচ্চতার নানা বয়সের নারকেলগাছেরা। তাতে দড়িতে বোনা নেটের দোলনা বাতাসে দুলছে। জিনিসপত্র রেখে সংলগ্ন বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। ধবধবে সাদা বালি। মাথার ওপরে অমল আকাশ, স্তরে স্তরে দুঃখহীন সাদা মেঘেরা, ঠিক সামনে দিগন্তরেখায় মিলে যাওয়া শান্ত সমুদ্রের অপার বিস্তার। এটি মূল সমুদ্রের অংশমাত্র (লেগুন)। জলের নীচে বিস্তৃত প্রবালদ্বীপের উপস্থিতি সামুদ্রিক উদ্দামতাকে প্রশমিত করেছে। তাই ঢেউ নেই এখানে। শুধু বাতাসের ধাক্কায় দোলা লাগছে আর তীরভূমি ধুয়ে দিয়ে যাচ্ছে জল - স্থির সংযত। জলের বুকে ছোট জেটিঘাট। জল অগভীর বলে বড় জাহাজ ঢুকতে পারেনা। তবে, কেউ যদি যেতে চায় কোচি বা কাভারত্তি, এখান থেকে ছোট বোট তাদের সেই জাহাজ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসে। ওরকম গোটাচারেক ছোট বোট নোঙর করা... নাচছিল জলের ঢেউয়ে। মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে এগোতে থাকি, পায়ে হেঁটে যতখানি যাওয়া যায়।
রিসর্টের মূল দরজাটি পার হয়েই সরু ও সর্পিল পিচের রাস্তা লম্বালম্বি সমান্তরালে চলেছে। এক মাথায় আগাট্টি বিমানবন্দর (যেখানে আমরা নেমেছি)

আর অন্যপ্রান্ত ধরে হেঁটে গেলে শহরের অন্য একটা অংশ। রাস্তাটার আড়াআড়ি কী? একটু দাঁড়িয়ে নজর করে দেখি, অন্যদিকেও সাদা বালি দেখা যাচ্ছে। ঢাল গেছে নেমে আর শোনা যাচ্ছে জলোচ্ছ্বাসের পরিচিত শব্দ। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে সামান্য যেতেই আবার সফেন সমুদ্ররেখা - গাঢ় নীল। মেঘের সঙ্গে মিল সাদা ফেনার আর আকাশের সঙ্গে জলের। অনন্তকাল ধরে এদের এই জানাচেনার খেলা! যে নরম উষ্ণ বাতাস গায়ে এসে লাগছিল, কে বলতে পারে কোন শতাব্দীর প্রাচীন গুহাকন্দর পার হয়ে, কোন পুষ্পবরণী আরবসুন্দরীর সুবাস বয়ে এনে আমাদের ছুঁয়ে যাচ্ছে! ধাঁধাঁয় পড়লাম। সাধারণত সমুদ্রশহরের একদিকেই সমুদ্র দেখেছি, অন্যদিকে থাকে গড়ে-ওঠা আধুনিক শহর। এখানে এমনটা কেন? কী রহস্য? বিস্ময়ের নিরসন হলো খানিক পরে। জানলাম, আগাট্টি দ্বীপটি দৈর্ঘে সাড়ে আট কিলোমিটার মতো, আর চওড়া? মাত্র তিন কিলোমিটার। মনে পড়ল স্কুলের ভূগোলে মুখস্থ করেছিলাম, "দ্বীপ হলো সমুদ্রের মধ্যবর্তী এক ভূখন্ড, যার চারদিকে জল।" আজ এত বছর পরে সমুদ্রতটে দাঁড়িয়ে তার সত্যিকারের উপলব্ধি হলো আমার। ততক্ষণে ঢেউয়েরা আমাদের পায়ের কাছে এসে ডাকাডাকি করছে। পা বাঁচাতে পিছিয়ে যাই, আলগা বালিতে গেঁথে যায় পা। এখানে বালিতে মাটির ভাগ খুব কম, লবণ বেশি। বালি লাগলে গা চটচট করে, সহজে ছাড়তে চায়না।

বালির পাড় ধরে ধরে চলছিলাম। ইতস্তত চোখে পড়ছিল নানান সামুদ্রিক প্রাণীর খোলসের টুকরো টাকরা। বেশ ধারালো অনেকগুলো। খালি পায়ে চলা মুশকিল। কিছুক্ষণেই আপাদমস্তক বালিমণ্ডিত উঠে এলাম রাস্তার ওপরে। এবার রাস্তা ধরে এগোই। দুপাশে বাউন্ডারির মাঝে ছোটো একতলা ঘরগুলো এখানকার মানুষজনের বসতি। মাঝখান দিয়ে সরু সিঁথির মতো ওই একমাত্র রাস্তা। একজন মধ্যবয়সী ডাব কেটে কেটে স্তূপাকারে রাখছিল। আমাদের দেখে বললেন, "গুড মরনিং। হোয়াট ইজ ইয়োর নেম?" নাম বললাম আমরা, তিনিও বললেন।

জানতে চাইলাম, ডাব পাওয়া যাবে কী না। মুশকিল হল, রাষ্ট্রভাষাটি এখানে অচল। ওরা নিজেদের মত ইংরেজি, মালয়ালাম ও আঞ্চলিক ভাষা মিলিয়ে কাজ চালায় ট্যুরিস্টদের সঙ্গে। আর আকার-ইঙ্গিত তো আছেই। এই লোকটির সঙ্গে আমাদের খুব ভাব হয়েছিল। বিচ রিসর্টের একজন কর্মী সে। আমাদের প্রতিটা নৌকাযাত্রায় একে পেয়েছি। মজলিশি মেজাজ, মিশকালো গায়ের রঙ, অসমান দাঁতের পাটি, আর মাথার নীল টুপি সমেত ছবিটা আঁকা হয়ে গিয়েছিল মনে।

সুনীল সাগরে শ্যামল কিনারে

প্রতিদিন মুহূর্তগুলোকে চেখে দেখেছি, কোথাও এতটুকু ফাঁকি দিইনি। যে বিচ্ছিন্ন নিমেষ সযত্নে সংগ্রহ ও সঞ্চয় করে সামগ্রিক রূপটি তৈরি হয়েছিল, তার কোনটি বেশি আনন্দদায়ক বলা শক্ত। বিভূতিভূষণের অপুর কথা মনে হল, "নিজের আনন্দের হিসেবে তুমিও একজন দেশ আবিষ্কারক।" গ্লাসবটম বোটে বসে সমুদ্রতল দেখার অভিজ্ঞতা আন্দামানে হয়েছিল একবার। তবু বারেবারে দেখা তো নয়! পায়ের কাছে তাই জলতলের রঙিন প্রবালদ্বীপের বিশালতা, জলচরদের অবাক জীবন স্বপ্নের মত ভেসে গেল চোখের ওপর দিয়ে। প্রবালরাজ্য কী রঙিন... পান্নার মতো, রক্তগোলাপের মতো, মার্বেলের মত। আমাদের আশেপাশে নির্ভয়ে ঘোরাফেরা করছিল মস্ত দুই কচ্ছপ। এরা ভারী মজার। প্রবালসমাজের দুই বিশিষ্ট বাসিন্দা - খুব বন্ধুভাবাপন্ন! দুপুরের খাওয়াটা বেশ। সামুদ্রিক মাছভাজা, চিকেন, আর কিছু নিরামিষ পদ। সরষের তেলের ব্যবহার নেই। চিংড়িমাছ খেতে এদের দেখিনি। ডাইনিংরুমে বসে আলাপ হলো সুইডিশ মা মেয়ের সঙ্গে। মেয়ে ডাক্তার, মা আর্টিস্ট। চাইনিজ ইঙ্ক-এ দ্রুত স্কেচ করছিল নারকেল গাছ, দোলনা, মানুষজন। রৌদ্রস্নান করে ঝলসে গেছে মাখনবর্ণ ত্বক, তবু ভারতীয় শ্যামলিমা পায়নি। হায়রে আমাদের শ্যামল-সুন্দরীরা! কবে যে কাটবে মোহ...।

পরের দিন সকালে যাওয়া হবে বাঙ্গারাম দ্বীপ। আগাট্টির মতন আরেকটি - এবং একেবারে নীল নির্জনে। বিভিন্নসূত্রে জানা গেছে, লাক্ষাদ্বীপের সাঁইত্রিশটির মধ্যে মাত্র দশটিতে মানুষের বসতি (২০০৫)। অন্যগুলো অভেদ্য কুমারী। পদচিহ্ন পড়েছে, অনুপ্রবেশ ঘটেনি। রাত্রের খাওয়া সেরে বালির ওপরে বিশ্রামচৌকিতে আধশোয়া হয়ে আরাম করছিলাম। সামনেই সমুদ্র। নিশ্চিন্ত নিরুত্তাপ আনন্দের মত শিরশিরানি এই সামুদ্রিক বাতাসে। ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যাচ্ছে আমাদের। অনেকদূরে বিন্দুর মতো কোনো জাহাজ বুঝি বা। অদূরে জেটিঘাটের স্তম্ভগুলোর নীচে ছলাৎ ছলাৎ করে চলেছে ঠাণ্ডা জল। তাদের ওপরে পড়ে থাকা অল্প আলোয় জেটিঘাটের ছায়া। পারাপারের ব্রিজটিতে আলো জ্বলছে। এখানে ভিড় নেই একেবারে। রাতের আকাশের অভিজাত চাদরে তারা ঝিলমিল। জলের ওপরে লক্ষ লক্ষ কিম্বা অগুনতি হয়ে ভেঙে গেছে তাদের আলোর ছবি। অনাদি অনন্ত যুগ ধরে চলেছে এমনটা। ভাবছিলাম, এক বছরও পূর্ণ হয়নি, এশিয়া ভূখন্ডের একদিকে সুনামি নামের যে প্রবল প্রলয় নাড়িয়ে দিয়ে গেছে মানবসভ্যতা ও তাদের আত্মবিশ্বাসের ভিত্তি, তার খবর অন্যপ্রান্তে নির্ভয়ে ভেসে থাকা এই সুখী দ্বীপ জানে কি?

শ্যামল সে দ্বীপ প্রবাল দিয়ে ঘেরা

পরদিন বাঙ্গারাম আর পরেলি। যেতে যেতে পথেই পাখিদের দ্বীপ। পাখপাখালিরা নির্ভাবনায় আসছে যাচ্ছে বসছে। কেমন রূপকথা রূপকথা অনুভূতি হচ্ছিল আমার। এই 'সাগরবিহঙ্গ'দের দ্বীপটি এখানকার ক্ষুদ্রতম। অথবা ঠিক দ্বীপও নয়, হঠাৎ গজিয়ে ওঠা চরের মতো। আমরা বসেছি ছোট মোটরবোটে। তার ছাউনি আছে, কিন্তু রোদের তাপ খুব বেশি। আমাদের সঙ্গী এক দক্ষিণী পরিবার, জাহাজে এসেছেন কোচি থেকে। তাঁদের অভিজ্ঞতার গল্প শোনাচ্ছিলেন। চোখের সামনে ক্রমশঃ পিছিয়ে যাচ্ছিল আগাটি - এতক্ষণে পূর্ণ পরিসরে দেখা যাচ্ছিল তাকে। ঘন নারকেল বনের ফাঁকে সাদা বালির আলপনা। রূপসী সমুদ্রকন্যার বুকে লুকিয়ে রাখা সবুজ মন। ক্রমে সমুদ্র গভীরতর হয়ে আসছে। ঢেউয়ের তালে জলের চূড়ায় মোচার খোলা আমাদের নৌকো দুলছে। পাশ দিয়ে সাঁতার কেটে চলে যাচ্ছে নানা সামুদ্রিক জীব। জল এখানে এত স্বচ্ছ যে খালি চোখেই প্রায় তলদেশ পর্যন্ত দেখা যায়। আমরা চপল হয়ে উঠেছি। জলে হাত ডোবাচ্ছি, ছেটাচ্ছি।

পাখির দ্বীপ শেষ হয়ে সরু হয়ে গেল। তারপরে বাঙ্গারাম। আরও সবুজ, নির্জন এবং প্রাকৃতিক। একপ্রান্তে জঙ্গল পরিষ্কার করে বিলাসবহুল পর্ণকুটির। সেখানে বেশির ভাগ সময়ে বিদেশি অতিথিদের দেখা মেলে। আসলে দক্ষিণাটিও তেমনই। ঘর ছেড়ে বেরোলেই সম্পূর্ণ উদার করে মেলে দেওয়া প্রকৃতির কোল... সমুদ্রের অথৈ থৈথৈ। জন্মদিনের পোশাকে সারাদিন ঘুরে বেড়ালেও সামুদ্রিক প্রাণী ও পাখিরা ছাড়া দেখার কেউ নেই। দেখতে পেলাম সেই ফরাসি-যুগল এখানেই আছেন এবং আপাতত সমুদ্রস্নানে ব্যস্ত। হাঁটতে হাঁটতে - একদিকে ঘন নারকেল বন, অন্যদিকে বিদেশিনীর চোখের মত জলরাশি। কী অনন্য! পরিশ্রান্ত হয়ে বসে পড়ো পেতে রাখা দড়ির দোলনায়, পাতাই আছে। কিম্বা শুধু বালির ওপরেই। এখান থেকে আবার ভাসলাম জলে। যেখানে

নামলাম, সে দ্বীপের নাম পরেলি। এক নয়, একজোড়া, নাম একটাই। একটা ছোট একটা কিছুটা বড়। এখানে নারকেল বন আর সামুদ্রিক জঙ্গল শুধু, আর কিছু নেই। আয়তনে আগাত্তির চেয়ে ছোট। নৌকো থেকে নেমে আবার পায়ে চলা। চমকে দেখি, পায়ের তলায় ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে কিছু... হাড়ের পাহাড়, কড়ির পাহাড়! শেষে ঠাকুমার ঝুলির কোনো অজানা রাজ্যে পৌঁছুলাম নাকি? পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখে বেসামাল হয়ে যাই। অজস্র - অজস্র - অজস্র প্রবালের টুকরো অংশ জমে জমে স্তূপ। নানান রঙ, নকশা, বিচিত্র গঠন তাদের। এরাও সমুদ্রের নীচেই ছিলো কখনও।

'সমাজতন্ত্র'

ইতিমধ্যে আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে কথা হয়েছে মোবাইলে। অনেকেই জানতে চেয়েছে, 'কী কী দেখলে? কী আছে দেখার মতো?' দেখার মতো? ভেবে ভেবে বলি... এই নীলরঙের জল, সাদারঙের বালি, জলের নীচে রঙচঙে প্রবাল... আর... আর নারকেল বন। এ-ইই, ব্যস। জবাব আসে, 'ওঃ! এ আর কী!'

আমাদের পাশের কটেজে যারা আছেন তাঁরা এসেছেন মধ্যভারত থেকে। মাঝবয়সী হাসিখুশি দম্পতি। ভদ্রলোক বিমানসংস্থার কোনো উঁচুপদে ছিলেন। অবসর নিয়েছেন। আজ ওঁদের সঙ্গী হলাম। আগাত্তির ছোটো গ্রামখানি দ্রষ্টব্য। একটা মারুতি ভ্যান জোগাড় হল বিচ রিসর্ট থেকে। কিন্তু কিছুদূর যেতে না যেতেই তিনি ন যযৌ...। একটু আশাহত হলাম। তবে উপলব্ধি হল, আসলে পায়ে হেঁটে না দেখলে দেখা হয়না কোনও জায়গাই। গাড়ির অল্পবয়সী চালকটিও নেমে পড়েছে, তাদের গ্রাম দেখাবে বলে ভারী উৎসাহ। সেই সিঁথির মত এক চিলতে পাকা রাস্তা - যেটা প্রথমদিন এসে দেখে ছিলাম। এই রাস্তাটা গ্রামের শেষ অবধি গেছে। পথে দেখলাম এক মসজিদ, প্রায় চারশো বছরের পুরোনো। তার গঠনপ্রণালী বা স্থাপত্য দেখে না বলে দিলে মসজিদ বলে বোঝা যায়না। একটা কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, এই দ্বীপের শতকরা একশোভাগ মানুষই মুসলমান। এঁরা কিন্তু সে অর্থে আদিবাসী নন (যেমন আন্দামানের জারোয়া, বা নীলগিরির টোডা, ছোটনাগপুরের সাঁওতাল বা মুন্ডা)। জনসংখ্যা প্রায় হাজার সাতেক মতো(২০০৫ সাল)। ভারত সরকার সযত্নে নিরাপত্তা ও উন্নয়ন ব্যবস্থা রেখেছেন এঁদের জন্যে - হয়তো তাই এঁরা যান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলশ্রুতি বিভিন্ন দূষণ সম্পর্কে ততটা ওয়াকিবহাল নন।

সরু ও সর্পিল পথখানির শেষে আবার সাদা বালি, আরেকটু এগোলেই সমুদ্র। ব্যাপ্তি যেহেতু আট কিলোমিটার মাত্র। আমাদের দেখে কয়েকটি ছোট ছেলে মেয়ে নিজেদের খেলা থামিয়ে এগিয়ে এলো হাসিমুখে। বেশ সুন্দর চেহারা, কালো দীঘল চোখ, উন্নত নাক, সমুদ্রের মতো সজল গায়ের রঙ। এরা এখানকার আদি অধিবাসীদের উত্তরসূরী। চেহারায় কিছুটা হলেও সাদৃশ্য আছে মধ্য এশিয়ার অধিবাসীদের সঙ্গে। ক্যামেরা আর অবাক হওয়া চোখ দেখে বুঝেছে আমরা ট্যুরিস্ট। ওরা অবশ্য এতে বেশ অভ্যস্তই। সঙ্গে কিছু লজেন্স ছিলো। দিয়ে ভাব করলাম। আলাপ করার চেষ্টা করতে, বাধ সাধলো ভাষা। এরা সকলে স্কুলে পড়ে... নম্র, ভদ্র, সুস্থ, প্রাণবন্ত। প্রকৃতই আলোকপ্রাপ্ত, অন্তরের আলোতে ভাস্বর। অনতিদূরে শিশু কোলেকাঁখে দু'একটি মা। আঠারো থেকে বাইশের মধ্যে বয়স। ছবি তুলতে চাইলাম। রাজি হলো না, সলজ্জ হাসিতে আমাদের ফিরিয়ে দিলো।

ছবির মতো সুন্দর গ্রাম, স্বচ্ছলতাও বেশ বোঝা যায়। ইলেকট্রিসিটি আছে, প্রাইমারি স্কুল, একটি সেকেন্ডারি স্কুলও দেখা গেল। উচ্চতর শিক্ষার জন্যে ভারতের মূল ভূখন্ডে যেতে হয়। পোষ্য আছে - ছাগল, মুরগি। ছোট দোকান বা ব্যবসা করেন কেউ কেউ, কিন্তু মূলত প্রয়োজনীয় জিনিস আসে জাহাজে, কোচি থেকে। চলতে চলতে চমৎকার আর এক অভিজ্ঞতা হলো। এখানে একটি 'কম্যুনিটি গার্ডেন' বা মাঝারি মাপের শাক-সবজির বাগান আছে। গ্রামবাসীদের বেশির ভাগ সেখানে কাজ করেন। প্রতিদিনের প্রয়োজন অনুযায়ী সবজির তালিকা ও মাপ লিখে কুপন কাটতে হয়। তারপর সেদিনের উৎপাদন অনুযায়ী বণ্টন করা হয়। একই জিনিসের চাহিদা বেশি থাকলে, উৎপাদন দেখে ভাগ করা হয়। কম হলে, যিনি বেশি চাইবেন, তাঁকেও হয়তো সেদিনের মতো অল্পে সন্তুষ্ট হতে হয়। 'সমাজতন্ত্র' একে বলা যায় কি?

আগাতি মসজিদ - প্রায় তিনশ বছরের পুরনো

আমরা কথা বলতে বলতে চলেছি। সেই আওয়াজে ঘর ছেড়ে বের হয়ে এসেছেন হাসিমুখ মহিলারা। বাচ্চারাও। আলাপ করতে চাই, ওরাও... কিন্তু উপায় নেই। সুন্দরীদের কানে পরা বিচিত্র সব নক্সাদার বড়সড় স্বর্ণাভরণ। এখানে চুরিডাকাতির ভয় নেই। প্রায় সকলের মাথা ঢাকা কিন্তু বোরখা পরতে দেখিনি কাউকেই। এক মিষ্টি চেহারার রোগাপাতলা তরুণী এসে ইংরেজিতে আলাপ করল আমাদের সঙ্গে। বেশ সপ্রতিভ। সে ওখানে প্রাইমারি ইস্কুলে অঙ্ক ও মালয়ালম পড়ায়। মনে হলো, আহা, এমন একটা জীবন যদি পেতাম, বইয়ে দিতাম সমুদ্রের রঙিন ঢেউয়ে ঢেউয়ে। ফেরার রাস্তায় দেখলাম ছোট মিউজিয়ামটি। অর্ধসমাপ্ত, কাজ চলছে। এদ্বীপ সেদ্বীপ থেকে সংগ্রহ করা নানান অমূল্য জিনিস ডাঁই করে রাখা একটি ঘরে। সাজানো হয়নি। আঠের বা উনিশ শতকের চিহ্নসমেত জাহাজের মাস্তুল, কম্পাস, সে সময়ের লণ্ঠন, কিছু তৈজসপত্র, ভাঙা মূর্তি... আপাতত এইসব দর্শনীয়। কোন ভিনদেশী নাবিক দিক দিশা হারিয়ে অজানা দ্বীপে এসে পৌঁছে গিয়েছিলেন, কোথায় এসে কেমন করে জঙ্গল কেটে বাসস্থান বানিয়ে তুলেছিলেন, কেমন করে কোন ভাষায় ধর্মপ্রচার শুরু করেছিলেন... ভাবছিলাম সেখানে দাঁড়িয়ে। গা-ছমছম করা অনুভূতি নিয়ে হারিয়ে যাচ্ছিলাম তিনশ' বছর পিছনে।

মৎস্য শিকার

ফিরে এসে দুপুরবেলার ভোজন ও বিশ্রাম। সমুদ্রের ধারে আরামচৌকিতে শুয়ে চোখ জুড়িয়ে আসছিল। নারকেলপাতার দুলুনি মাথার ওপরে। পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো দুবোর্ধ্য নক্সা কাটছে নীচে। হঠাৎ আমার কত্তামহাশয়ের গলার আওয়াজ পেয়ে দেখি, অদূরে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন কারও সঙ্গে। কী ব্যাপার! না, মাছ ধরতে যাওয়া হবে। দারুণ খুশি হয়ে চটপট চটি গলিয়ে নিলাম। বোটে চড়ে বসলাম। এটা 'ফিশিং' বোট। যে বোটে দ্বীপান্তরে গিয়েছিলাম এটি তেমন নয়। প্রবল নাচের তুমুল ছন্দে লাফাতে লাফাতে চলছে আমাদের নৌকো। এত দুলছে যে টাল সামলাতে পারছিনা। শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরেছি রেলিং। একটু নড়াচড়ার চেষ্টা করলেই হয়তো পপাত সমুদ্রতলে। দেখলাম, সবাই বেশ মাছ মারতে উৎসাহী হয়ে পড়েছেন। নৌকার মাঝিরা বড়শিতে গেঁথে দিয়েছে মাছের চাড়। জলে ফাতনা ডুবিয়ে বসে বসে ধৈর্যের পরীক্ষা দিই। এমন অভিজ্ঞতা আগেও হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে বলে মনে হয়না। হঠাৎ নীচের বড়শিতে টান। উত্তেজনা তুঙ্গে। ইউরেকা ! ইউরেকা ! এ্যায়সা টান মেরেছি আমিও... কোথায় কী! ভোঁ ভাঁ। আমার শিকার অনেক চালাক। ছুঁয়েই বিপদ বুঝে খাবার মুখে নিয়ে পালিয়ে গেছেন। এরই মধ্যে কী করে কে জানে, আমার কন্যা গেঁথে ফেলেছে একটা সত্যিকারের মাছ... হুমড়ি খেয়ে দেখি তাকে। কালো রঙ, পমফ্রেট ও তেলাপিয়ার মাঝামাঝি একটা চেহারা।

নৌকার গলুই থেকে ঝুঁকে চেয়ে দেখি টলটল করছে জল। খালি চোখে তাকিয়ে থাকি, জলের তলায় অসংখ্য রঙিন মাছেরা নিশ্চিন্তে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে।

যেন স্বপ্নপুরী, টেলিভিশনে দেখা 'ডিসকভারি' চ্যানেল। মনখারাপ হয়ে যায়, আর একদিন মাত্র। তারপরে বাস্তবের প্রবল দূষণে স্বপ্নের রঙিন বুদবুদ ফেটে যাবে। বেঁচে থাকবে স্মৃতি। অভিজ্ঞতা।

চাঁদের সাম্পান

রাতের খাওয়ার মেনুটি একটু স্পেশাল হলো। অতিথিদের জন্যে আঞ্চলিক কিছু পদ রেঁধেছিলেন গ্রামের মহিলারা। একটু গোল ও মোটা চালের ভাত, নারকেলের দুধে ফোটানো সামুদ্রিক মাছের বিশেষ ডিশ। দু'একটা সবজিও। ডাইনিংরুমের বাইরে ঝুরো বালিতে পাতা হয়েছিল সমস্ত চেয়ার টেবিল। মাথার ওপরে খোলা আকাশে ঝুলছিল চাঁদ। তারারা সাজিয়েছিল ঝাড়লণ্ঠন। নারকেলগাছে বাঁধা দড়ির দোলনা দোল খাচ্ছিল সমুদ্রবাতাসে। গাছেদের গা বেয়ে ওঠানামা করছিল অসংখ্য ঝিনুক। এই রাতটার কথা বহুকাল মনে পড়বে।

আমি মানব একাকী

একটি অল্পবয়সী দম্পতি এসেছে ব্যাঙ্গালোর থেকে। দুটিতেই ইঞ্জিনিয়ার, আই-টি কোম্পানিতে কাজ করে। একজোড়া ইহুদী দম্পতি... এরা প্যালেস্টাইন থেকে। আমাদের পাশের কটেজের অতিথিরা চলে গিয়েছেন। ওঁদের জায়গায় এই দুটি। সারাদিন সাঁতারের পোশাক পরা। বেশ বিপুল বপু দুজনেরই। গায়ের রঙ সোনালি, চুল কালোর কাছাকাছি। জলচর প্রাণীদের মতো সারাটা দিন জলে বা বালিতে। বিশেষ চশমা পরে জলে ডুবছে, ভাসছে, বালি মাখছে সারা শরীরে। পিঠে বাঁধা অক্সিজেন সিলিন্ডার। আমরা সকলে সঙ্গী হয়ে গেলাম আর এক দ্বীপে। নাম কালপিট্টি।

ছোট্টো গোলাকার দ্বীপ। এখানে 'কিছুই' নেই। সাদা ঝক্‌ঝকে বালিতে প্রতিফলিত হচ্ছে সূর্যের আলো, চোখ ধাঁধাঁচ্ছে। যতদূর চোখ ছড়াই ধূধূ জল আর জল। ঢেউ এসে পাড় ভাঙছে বারেবারে, ভাঙছে তার নিস্তব্ধ ধ্যান। আমরা বালি পেরিয়ে জলে নেমেছি, কোমরজল ভেঙে এগিয়ে চলেছি এমনিই... উদ্দেশ্যহীন। জায়গায় জায়গায় কবে থেকে বালি জমে পাথর হয়ে আছে। ওখানে এসে আছাড় খাচ্ছে জল। ওর ফাঁকফোকরে কাঁকড়াদের বাড়িঘর। লক্ষ লক্ষ ছটফটে কাঁকড়া আসা যাওয়া করছে। বালিতে কাঁকড়া দেখেছি অনেকবার... কিন্তু এ একেবারে অন্যরকম। ক্রমে তীরভূমি সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছে। আমরা জল ভাঙছি। বাঁদিকে দিশাহীন অনন্ত সমুদ্র, ডানদিকে জংলা ঝোপঝাড়। কিছু মৌমাছি ওড়াউড়ি করছিল, হাত দিয়ে নিজেদের বাঁচাতে বাঁচাতে চলছিলাম। আমরা কৃত্রিমতার মানুষ, ভয় হচ্ছিল, বিষাক্ত পোকামাকড় বা মনসাপুত্রদের দেখা পেলে কী করব! আমাদের নৌকো যে কোথায় বোঝা যাচ্ছিলনা। জলচর ইহুদি দুজনকেও দেখতে পাচ্ছিলামনা। প্রায় পুরো দ্বীপটির প্রদক্ষিণ সেরে ঝলসানো বেগুনপোড়া চেহারায় চোখে পড়লো নৌকো। অবাক হয়ে দেখলাম যেখান থেকে শুরু করেছিলাম, এতোটা ঘুরে আবার সেখানেই! বসলাম উঠে, ধড়ে প্রাণ এলো। আর, দ্বীপের মধ্যে জলের কাছাকাছি এক বিড়াল... বেশ তাগড়া, স্বাস্থ্যবান। কোত্থেকে এসেছে কে জানে? আমাদের দিকে চেয়ে মিঁউমিঁউ করলো।

বিকেলের দিকে প্লাস্টিকের নৌকো চেপে 'কায়াকিং' করতে গেল আমাদের কন্যা। নিজেই দাঁড় বাইল। এই বোটগুলো বালির ওপরে রাখাই থাকে। যখন খুশি নিয়ে নেমে পড়ো জলে। ঘন্টাখানেক জল ছিটিয়ে উঠে এল সে। আপাদমস্তক জল ও বালিতে মাখামাখি, খুশিতে উজ্জ্বল।

উলটোরথ

আমাদের মেয়াদ ফুরোলো, নটে গাছটি মুড়োলো। সকাল এগারোটায় আমাদের উড়োজাহাজ ছাড়বে আগাট্টি এয়ারপোর্ট থেকে। ভোরবেলা উঠে পড়েছি। মেয়ে আরও একবার কায়াকিং করে এলো নৌকো ভাসিয়ে। চটপট গুছিয়ে নিয়েছি প্যাঁটরা, ব্রেকফাস্ট সারা হলো। ঘুমঘুম চোখ নিয়ে আমাদের দিকে চেয়ে আছে সমুদ্র। রিসেপশন কাউন্টারে বাকী জমাখরচের হিসেব মেলানো... আবার আসার জন্যে অনুরোধ। কী পেলাম, কী জমা পড়ল, তা হিসেবনিকেশ পরে করা যাবে। কিন্তু একী! এই চারদিনেই কি অপূর্ব মায়ায় বেঁধে ফেলেছে এই স্বপ্নের চেয়ে সুন্দর পৃথিবীর কোন। আপাতদৃষ্টিতে তেমন কিছু নেই, আর যা আছে তাতো বলেইছি। চোখধাঁধাঁনো আড়ম্বর নয়, এর সৌন্দর্য এর স্বচ্ছতা, অকৃত্রিমতা, প্রকৃতির মার্ধুয। না আছে শহর বাজারে ঝকঝকানি, না হ্যান্ডিক্রাফটের সারসার দোকান, না গন্ধে প্রলুব্ধ করা রেস্তোরাঁ।

যাওয়ার সময়ে পেছন ফিরে বারবার দেখছিলাম - শ্বেত বেলাভূমির কোল ঘেঁষে চঞ্চল সমুদ্রসখার অনন্তকালের খেলা। না আছে বিশ্রাম, না পরিবর্তন। আমাদের বিমান ছাড়লো, গন্তব্য কোচি এয়ারপোর্ট। আমরা উড়তে শুরু করলাম। ধীরে ধীরে ছোট হয়ে এলো দ্বীপগুলো তাদের বিস্তৃত বালুকাবেলায় অনন্ত আনন্দের আহ্বান নিয়ে। তারপর ক্রমশ আরো ছোট ... মিলিয়ে গেল। আর দেখা গেলো না। মনে মনে বললাম, আসব আসব আসব।

~ লাক্ষাদ্বীপের তথ্য ~ লাক্ষাদ্বীপের আরও ছবি ~

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী শ্রাবণী দাশগুপ্ত বর্তমানে থাকেন স্বামীর কর্মসূত্রে রাঁচিতে। কিছুকাল স্কুলে পড়ানোর পর বাড়িতে থিতু হয়ে এখন লেখালেখি আর বই পড়াই ভাললাগার বিষয়। বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিন এবং ই-ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে ছোট গল্প। প্রথম পছন্দ পাহাড় - জঙ্গলও খুব প্রিয়। বেড়াতে ভালোবাসলেও ভ্রমণ কাহিনি লেখায় হাত পাকানো অল্পদিন।

কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com

স্বপ্নের লাদাখ

অভিষেক দাস

~ লাদাখের তথ্য ~ লাদাখের আরো ছবি - (১) - (২) ~

ট্রেনে করে বেড়াতে যেতে খুউব ভালবাসি আমি (আগে ভাবতাম আমি বুঝি ব্যতিক্রম, তারপর দেখলাম আমার মত অনেকেই আছেন), কিন্তু এই প্লেনযাত্রা আমার চিরকাল মনে থাকবে। জম্মুর সবুজ উপত্যকার একটু একটু করে খয়েরি হয়ে যাওয়া, তারপর বরফে মোড়া শ্বেতশুভ্র পাহাড়চূড়া, আচমকা ঝাঁকুনি আর শেষে লে এয়ারপোর্টের রানওয়ের নিশানা। বাড়ি থেকে বেরোনোর দু-দিন পরে আমরা পৌঁছলাম আমাদের স্বপ্নের গন্তব্যে।

এয়ারপোর্টের প্রিপেড কাউন্টার থেকে ট্যাক্সি বুক করলাম। ড্রাইভার স্তানজিন তার মারুতি ওমনির মাথায় মালপত্র চাপিয়ে আমাদের পৌঁছে দিল লে-লিং গেস্ট হাউসে। সামান্য মাথা ধরেছিল, মনে হয় লে পৌঁছনোর আগেই ডায়ামক্স ট্যাবলেট খেয়ে রাখাটা বেশ কাজে দিচ্ছিল। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে এখনও সেভাবে ট্যুরিস্ট সিজন শুরু হয়নি। হোটেলের আমরাই একমাত্র বোর্ডার, তাই পছন্দমত ঘর বেছে নেওয়া গেল। হোটেল মালিক শ্রী দোরজি পরামর্শ দিলেন আজ স্নান না করতে। আমরা বাধ্য ছাত্রের মত তাঁর উপদেশ শিরোধার্য করলাম। দুপুরের খাওয়া হল 'সামার হার্ভেস্ট'-এ (লে-র অন্যতম সেরা রেস্তোরাঁ)। স্তানজিনের সঙ্গে আগামী দিনগুলোর পরিকল্পনা ঠিক করে নিয়ে বাকী সময়টা কাটালাম পুরোপুরি বিশ্রামে – আসার আগে প্রতিটি ব্লগে যা পড়েছি তা একেবারে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে।

২য় দিন –

সকালে প্রাতরাশ সেরে রওনা দিলাম হেমিসের উদ্দেশে। পথে যে ছবি তোলার জন্য কতবার দাঁড়ানো হল তার হিসেব রাখিনি। লাদাখের প্রতিটি আনাচে কানাচেই ছবির বিষয়বস্তু ছড়িয়ে।

বাঙালির স্বভাব হল বেড়িয়ে ফেরার সময় আত্মীয়-বন্ধুদের জন্য উপহার কিনে আনা আর দলে যদি মহিলা থাকেন তাহলে তো কেনাকাটা বেড়ানোর প্ল্যানেরই একটা অংশ। কিছু স্যুভেনির কিনে গেলাম থিকসে। তুলনায় হেমিস বেশি ভাল লেগেছে, কিন্তু হেমিস মনাস্ট্রিটা পাহাড়ে ঘেরা – আর থিকসে থেকে আশপাশের দৃশ্য অপরূপ দেখায়। হেমিসে লামাদের জীবনযাপনের আন্দাজটা ভাল বোঝা যায় আর সবথেকে বড় ব্যাপার সিঁড়ি কম ভাঙতে হয়!

দুপুরের খাওয়াটা আহামরি কিছু হলনা, শুনলাম শ্রীনগর হাইওয়ে চালু না হওয়ায় রান্নার উপকরণ এখনও এসে পৌঁছায়নি (এই কথাটা অবশ্য আমাদের পুরো বেড়ানোতেই বার বার শুনতে হয়েছে)। লাঞ্চের পরে গেলাম 'র‍্যাঞ্চোর স্কুল' দেখতে। সঙ্গী গাইড বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন এমনভাবে স্কুলবাড়িটা তৈরি হয়েছে যাতে লাদাখি আবহাওয়াতেও কৃত্রিম হিটিং-এর প্রয়োজন না হয়। অসাধারণ ব্যাপারটা – ইঞ্জিনিয়ারিং-এর একটা দুর্দান্ত নিদর্শন। আমাদের 'থ্রি ইডিয়ট'-এর পোজে ছবি তোলা দেখে গাইড ভদ্রলোক হো-হো করে হেসে উঠলেন। পরবর্তী গন্তব্য সিন্ধু ঘাট। বেশ অগোছালো জায়গা, কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মন কেড়ে নেয়। সিন্ধু নদের জল একেবারে স্বচ্ছ এখানে। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। লাদাখে প্রতিটা সন্ধ্যেই দেখবার মত। আকাশে মেঘ-সূর্যের লুকোচুরি আর তার সাথে সাথে পাহাড়ের গায়ে আলো-আঁধারির অপরূপ খেলা।

ফেরার পথে পড়ল চোগলামসার গ্রাম – বছর কয়েক আগের বন্যার চিহ্ন এখনও কিছু রয়ে গেছে। সন্ধ্যাটা শান্তি স্তূপে কাটাবো ঠিক করলাম। বেশ একটা অ্যাডভেঞ্চারই হল বলা চলে। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, আক্ষরিকভাবেই হি-হি করে কাঁপছিলাম। মিনিট দশেকের বেশি থাকা গেলনা। তবে আনন্দ

কিছু কম হয়নি তাতে।

৩য় দিন –

আজ এখানে লোকসভা নির্বাচন। আমরা নিশ্চিত ছিলাম না ঘোরাঘুরি করা যাবে কিনা। হাসপাতাল ছাড়া বাকী সবকিছুই বন্ধ। একটা আর্মি ক্যান্টিনে জলখাবার সেরে গেলাম সঙ্গম দেখতে। সিন্ধু আর জাঁসকরের রঙ একেবারে আলাদা করে চেনা যায় ওপর থেকে। নীচে নামলে যদিও দুই-ই স্বচ্ছ লাগে। এরপর যাওয়ার কথা ছিল ম্যাগনেটিক হিল – সঙ্গমে অনেকটা সময় কেটে গিয়েছিল, তাই চৌম্বক শক্তি পরখ করার পরিকল্পনা বাদ দেওয়া হল। এরপর পাথর সাহিব – ছোট কিন্তু চমৎকার সাজানো-গোছানো একটা গুরদোয়ারা।

লাদাখ এমনিতেই এত সুন্দর যে কোন কোন স্পট তেমন আকর্ষণীয় মনে না হতে পারে। কিন্তু মিনিট দশেক অন্ততঃ কাটানোই যায়। এমনই একটা জায়গা 'হল অফ ফেম'। এখানে ফোটোগ্রাফির বিষয় কিছু নেই, কিন্তু এলে গর্ববোধ হবে একজন ভারতীয় হিসেবে - হিমেল হাওয়া ছাড়াই গায়ে কাঁটা দেবে। বাবাকে লেখা কর্নেল রবিনের চিঠি আর গর্বিত পিতার উত্তর দেখতে ভুলবেন না যেন। পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলে পড়বে একটা স্মৃতিসৌধ – প্রেক্ষাপটে তুষারঢাকা হিমালয়। আবার নৈসর্গিক সৌন্দর্যে ফিরে আসা।

দিনের শেষ গন্তব্য কালীমাতা মন্দির – স্পিটুক মনাস্ট্রির ঠিক ওপরে। লে এয়ারপোর্টের রানওয়েটা পরিস্কার দেখা যায়। শুনলাম এখান থেকে এরোপ্লেনের ল্যাণ্ড করা দেখতে দুর্ধর্ষ লাগে। ফেরার আগে একবার দেখার চেষ্টা করব ভেবে রাখলাম। কয়েক ধাপ উঠলেই কালীমাতা মন্দির। অন্ধকার, গা-ছমছমে ঘর আর ভিতরে তেমনই ভয়ালদর্শন দেব-দেবীদের মূর্তি। একটামাত্র টিউব লাইট টিমটিম করে জ্বলছে। মুগ্ধ হয়ে গেলাম মনাস্ট্রির সামনের উপত্যকায় সূর্যাস্ত দেখে।

৪র্থ দিন –

এবার যাওয়া নুব্রা ভ্যালি – আরেক রাউণ্ড ডায়ামক্সের পালা। খুব উত্তেজিত সবাই – প্রথম বরফের রাজ্যে পৌঁছানো হবে। শেষ অবধি বোনাসই পাওয়া গেল – খারদুং লা-তে বরফের পাশাপাশি তুষারপাত-ও। অসাধারণ অভিজ্ঞতা বললেও কম বলা হবে! একটা ছোটখাট ফোটোসেশন সেরে (ঠাণ্ডার জন্য বেশিক্ষণ থাকা যাচ্ছিল না) নামতে থাকলাম নুব্রার উদ্দেশে। পথে দেখলাম দিস্কিট মনাস্ট্রি এবং বিখ্যাত বুদ্ধমূর্তি (স্থানীয় লোকজনের বিশ্বাস বুদ্ধদেব পাকিস্তানের দিকে মুখ করে আছেন এবং এখানকার মানুষকে রক্ষা করছেন বহিরাগতের আক্রমণ ও প্রকৃতির রোষ দুইয়ের থেকেই)। একটু পরেই এল বালির ঝড় – একই দিনে তুষারপাত আর বালির ঝড় দুই-ই দেখতে পাব স্বপ্নেও ভাবিনি! স্তানজিন অবশ্য বলল এখানে এটা খুবই সাধারণ ব্যাপার।

এরপর বালিয়াড়ির পালা। দু-কুঁজওলা উটের পিঠে চড়া মজাদায়ক কিন্তু পনের মিনিটের রাইডের জন্য মাথাপিছু ১৮০ টাকা খরচ বেশ গায়ে লাগে। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে এখনও বেশ ঠাণ্ডা এখানে, তাঁবুতে না থাকতেই বলল সবাই। ৯০০ টাকা ভাড়ায় ভালই হোটেল পাওয়া গেল। তবে পিক সিজনে গেলে আগে থেকে ঘর বুক করে যাওয়াই ভাল হবে। এখানে রেস্তোরাঁ নেই, হোটেলে যা পাওয়া যায় তাই খেতে হবে।

৫ম দিন-

লে ফেরার পথে পানামিকের উষ্ণ প্রস্রবণ দেখতে যাওয়া হল। যাঁরা হিমাচল প্রদেশের মণিকরণ গিয়েছেন পানামিক তাঁদের বিশেষ আহামরি লাগবে না। আরেক রাউণ্ড ফোটোসেশান খারদুং লা-য়। পরের দিন প্যাংগং সো যাওয়া হবে তাই খানিক তাড়াতাড়ি রণে ভঙ্গ দেওয়া গেল।

৬ষ্ঠ দিন –

একে তো রওনা হতে বেশ দেরিই হয়েছিল, রাস্তায় একটা ছোট ধ্বসের জন্য আরো কিছু সময় গেল। আবারও তুষারপাত পেলাম – এবার চ্যাং লাতে। প্যাংগং পৌঁছাতে অনেক দেরি হল। আমাদের ড্রাইভার বলল আমরা সকলের শেষে পৌঁছেছি, লে ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যাবে। শেষ অবধি অবশ্য তা হয়নি। লেকের আশপাশে হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডা। এত শীতল হাওয়া আর কখনও পাইনি। শরীরের প্রতি সেন্টিমিটার জায়গা গরম পোশাকে ঢেকে না রাখলে এই আবহাওয়ায় টেঁকা যাবেনা। মনে মনে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে স্যালুট জানালাম। প্যাংগং লেক চিনের মধ্যেও চলে গেছে। বর্ডার এত কাছাকাছি হওয়ায় সেনা তৎপরতা এখানে খুবই। সেনারা ইগলুর মত একরকম ঘরে থাকেন – বরফের সাথে মিশে গিয়ে ক্যামোফ্লেজের কাজ করে সেটা। প্যাংগং লেকের দৃশ্যই পুরো বেড়ানোয় সবথেকে সুন্দর লেগেছে আমার। জলে অল্প অল্প ঢেউ, খানিকটা

যেন শান্ত সমুদ্রের মত একটা শব্দ। লেকের পাশে বেশ কিছু খাবারের দোকান – মান বেশ খারাপ, কিন্তু বিকল্প কিছু না থাকায় ওখানেই খেতে হবে। ফেরার পথে ইয়াক, মিষ্টি দেখতে বিভার, বুনো ঘোড়া, ভেড়ার পাল, চেনা-অচেনা নানান প্রাণীর ছবি তুলতে কয়েকবার গাড়ি থামানো হল।

৭ম দিন –

আজ লাদাখে শেষ দিন -তাই মন খারাপ সকলের। ভোরে আবার স্পিটুক যাওয়া হল – এরোপ্লেন নামার ছবি তোলার জন্য। মিনিট পঁয়তাল্লিশ অপেক্ষা করার পর অবশেষে সুযোগ মিলল। যদি কারও আগ্রহ হয় মনাস্ট্রি অবধি না গিয়ে পথে কোথাও যেখানে রানওয়েটা সোজাসুজি দেখা যায় সেখানেই দাঁড়ানো ভাল। ওপর থেকে খানিক কোণাকুনি হয়ে যায়।

শেষ গন্তব্য লে প্যালেস। বিশাল একটা বাড়ি – প্রায় ফাঁকা। নামে প্রাসাদ কিন্তু রাজারাজড়ার কোনও চিহ্নই নেই এখানে। যা কিছু ছবি আছে সবই বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কিত। তবে এখান থেকে লে শহরের একটা প্যানোরামিক ভিউ পাওয়া যায়। ভাল জুম সঙ্গে থাকলে এয়ারপোর্টেরও ছবি তোলা যেতে পারে। আমাদের সৌভাগ্য যে গো-এয়ার ফ্লাইটটার নামার ছবি তুলেছিলাম, সেটা একটু পরেই আবার উড়ে গেল - সে ছবিও তাই ক্যামেরায় ধরা রইল। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া প্যালেসের অনেকটা সংরক্ষণ করেছে – প্রচুর কাঠের জানলা-দরজা আর সিঁড়ি দেখা যায়। আমার মতে এখানে মিনিট কুড়ির বেশি সময় কাটানোর কোনও মানে হয়না। স্তোক প্যালেস যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করলাম, প্রাসাদ আর মনাস্ট্রি দেখতে দেখতে খানিক ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম সকলেই। তাই আমাদের স্বপ্নের বেড়ানো এখানেই শেষ হল। এরপর দলের মহিলাদের শপিং টাইম শুরু আর বেচারি পুরুষরা তাঁদের পিছু-পিছু – ব্যাগ বওয়ার জন্য তো কাউকে একটা লাগবে!

যদি হাতে আরও কয়েক দিন থাকে এই জায়গাগুলিও ঘুরে আসতে পারেন –
- আলচি-লামায়ুরু সার্কিট (মনাস্ট্রি আর প্যালেস)
- সো মোরিরি লেক (লে থেকে ২০০ কিমি দূরে তাই রাত কাটানো বাঞ্ছনীয়)
- কারগিল-জাঁসকর (এখানেও রাতে থাকতে হবে)

খেয়াল রাখবেন –

☐এরোপ্লেনে লাদাখ গেলে উচ্চতাজনিত কারণে অসুস্থতা হতে পারে। আগে থেকেই উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন। আমরা ডায়ামক্স ট্যাবলেট খেয়েছিলাম।

☐প্লেনে নিয়মানুযায়ী কেবিন লাগেজ নেওয়া যায়না। (এয়ার ইণ্ডিয়া যদিও আমাকে রুকস্যাক সঙ্গে রাখতে দিয়েছিল)। উপায় হল ভারি শীতের পোষাক আগে থেকেই পরে নিন ব্যাগের ওজন কমানোর জন্য।

☐সিকিউরিটি অফিসাররা আমাদের ক্যামেরার পেন্সিল ব্যাটারি সঙ্গে রাখতে দেননি। লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি নিতে যদিও বাধা দিচ্ছিলেন না।

☐গোটা ট্রিপের জন্য একই ড্রাইভার/গাড়ি ঠিক করবেন দরাদরি করে। সাধারণতঃ ১০-১৫ শতাংশ ছাড় পাওয়া যায় এতে। ওমনি বা ইকো-র পরিবর্তে স্করপিও/জাইলো/ইনোভা জাতীয় তুলনায় আরামদায়ক গাড়ি ভাড়া করাই ভাল।

☐প্রচুর তরল খাবেন। আমরা সঙ্গে গ্লুকন ডি-র বোতল রাখতাম। হালকা খাওয়াদাওয়া করবেন। একসঙ্গে বেশি খেলে বমি হতে পারে।

☐মে মাসের মাঝামাঝির আগে গেলে রাস্তার পরিস্থিতি ভাল করে খোঁজ নিয়ে নেবেন। আমাদের সময় ১১ মে লাদাখ যাওয়ার রাস্তা চালু হয়েছিল। ভাগ্যিস আমাদের গাড়িতে যাতায়াতের পরিকল্পনা ছিল না।

☐বিদ্যুৎ সরাবরাহে প্রায়ই বিঘ্ন ঘটে। হোটেলে বিকল্প কী ব্যবস্থা আছে জেনে নেবেন।

☐কাশ্মীরের বাইরের শুধুমাত্র বিএসএনএল আর এয়ারটেলের পোস্টপেইড সিম কার্ডই কাজ করে। পৌঁছে স্থানীয় সিম কার্ড কিনে নেওয়ার পরিকল্পনা রাখবেন না। বাইরের লোকেদের ওই সিম কার্ড দেওয়া হয়না।

☐নানারকম খাবার দাবার একমাত্র শ্রীনগর হাইওয়ে চালু থাকলে তবেই পাওয়া যায়। অন্যথায় খাবার পছন্দ খুবই সীমিত।

☐বাজেট ট্র্যাভেলার হলে জনপ্রিয় ওয়েবসাইট দেখে চটজলদি হোটেল বুক করবেন না। মোটামুটি ১০০০ টাকার মধ্যে বেশ ভালই হোটেল পাওয়া যায়। হোটেল ও গাড়ি ভাড়ার জন্য http://leh.nic.in/ দেখুন।

অনুবাদ – রত্নদীপ দাশগুপ্ত

~ লাদাখের তথ্য ~ লাদাখের আরো ছবি - (১) - (২) ~

উইপ্রোর হায়দ্রাবাদ শাখায় কাজের সূত্রে প্রবাসী বাঙালি অভিষেক দাস বেড়াতে অসম্ভব ভালোবাসেন। 'বাঙালিজ ইন হায়দ্রাবাদ' সংগঠনের ট্রাভেল টিমের প্রধান অভিষেকের অবশ্য পাহাড় একটু হলেও বেশি পছন্দের। তবে পুজোর সময় কলকাতায় আসা চাই-ই।

কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com

অন্য ইতালি

কাকলি সেনগুপ্ত

~ ত্রিয়েস্তের আরো ছবি ~

সম্পাদক বললেন, "ইতালি ঘুরে এলে, সেই নিয়ে পত্রিকায় কিছু লেখো।" আমি ভাবি, কী নিয়ে লিখি? ভেনিস-রোম-ফ্লোরেন্স-মিলান – সর্বত্রই বাংলা ছবির নায়ক-নায়িকারা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। টিভি খুললেই দেখি ইতালির অপূর্ব সব ভাস্কর্যের সামনে বাংলা সিনেমার কুশীলবরা চিত্র-বিচিত্র পোশাকে নেচে চলেছেন। মিলানের রাস্তায় তো পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের পোশাকে এক অভিনেত্রীকে নাচে যোগ দিতে দেখলাম, বেশ লাগলো। সেই নাচের সূত্র ধরে বাংলা সিনেমা-টিভির দর্শকেরা দেখে নিয়েছেন ইতালির বিখ্যাত শহরগুলির দ্রষ্টব্য সব জায়গা। এর মাঝে আমি যদি ইতিহাসের পাতা খুলে বলি - ভ্যাটিকানের সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারের ওই ওবেলিস্কটা চার হাজার বছরের পুরনো। সাঁইত্রিশ খ্রীষ্টাব্দে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া থেকে রোমে নিয়ে আসা হয় সম্রাট ক্যালিগুলার নির্দেশে। পরবর্তীকালে সম্রাট নিরোর সার্কাসের মধ্যমণি ওই ওবেলিস্ক হাজার হাজার বছরের ইতিহাসের সাক্ষী। এর সামনে গ্লাডিয়েটররা লড়াই করেছে। যীশুর অনুগামী হওয়ার অপরাধে অজস্র মানুষকে অত্যাচার করা হয়েছে; ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে ক্ষুধার্ত সিংহের সামনে = এখানেই। এর সামনে সেন্ট পিটারকে মাথা নীচু করে ক্রুশে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ঠিক এর সামনেই নাচাগানা না-ই বা করলে! .... কিন্তু তাতে বোধহয় আমার কপালে 'বেরসিক' উপাধি-ই শুধু জুটবে। আনন্দের হাটে তালভঙ্গ হোক, কে-ই বা চায়! উৎসব চলতে থাকুক। আমরা বরং উত্তর ইতালির ছোট্ট শহরের এক কোণে পড়ে থাকা অজানা ইতিহাসকে একটু নেড়েচেড়ে দেখি।

এমনই এক ছোট্ট সুন্দর বন্দর-শহর উত্তর ইতালির ত্রিয়েস্তে (Trieste)। ভেনিস থেকে দু'ঘন্টার সফরে রেল অথবা সড়কপথে পৌঁছে যাওয়া যায়। ভেনিসের তুলনায় খানিকটা উঁচুতে পাহাড়ের পাদদেশে, আদ্রিয়াতিক সাগরের গা-ঘেঁষা এই শহরের ইতালীয় পরিচয় বেশ নতুন। দীর্ঘকাল ত্রিয়েস্তে ছিল অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয় সাম্রাজ্যের অংশ। এখানকার অধিবাসীরা বেশিরভাগই ছিল স্লাভ (Sloven)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে স্লাভদের আধিক্য নষ্ট করে ইতালীয়দের প্রভাব ও সংখ্যা বাড়তে থাকে। 'ব্ল্যাক শার্ট' মিলিশিয়াদের এ ব্যাপারে যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। এখন অবশ্য এটি পুরোদস্তুর ইতালীয় শহর।

এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে ভেনিসে নেমে না-গরম না-ঠাণ্ডা, বেশ আরামদায়ক আবহাওয়া পেয়েছিলাম। কিন্তু শেষ বিকেলে যখন ত্রিয়েস্তে পৌঁছলাম, তখন খানিকটা ঠাণ্ডা হতে শুরু করেছে। ঘটনাচক্রে এপ্রিলের শেষ ক'দিন রাতে হিটারও চালাতে হয়েছিল। মে মাসে ত্রিয়েস্তের আবহাওয়া চমৎকার। ঝকঝকে রোদ উঠলেই সমুদ্রসৈকতে রোদ পোহানোর ভিড়। ত্রিয়েস্তে হচ্ছে ইতালির কফি-রাজধানী। অজস্র কাফে ছড়িয়ে রয়েছে সারা শহরে। একশো বছরের পুরনো কাফে সান মার্কোর খ্যাতি ছড়িয়েছে জেমস জয়েস ও সমসাময়িক বহু লেখক-শিল্পীর আড্ডাঘর হিসেবে। কিন্তু শহর ঘুরতে-ফিরতে আমার বারবার মনে হয়েছে এই শহরে অল্পবয়সী ছেলেমেয়ের সংখ্যা খুব কম। অল্পবয়সীরা কাফের থেকেও বার-এ যেতে বেশি পছন্দ করে। খোলা চত্বরেও (Piazza, Square) দেখা যায় ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে আড্ডা মারছে। আর কাফেতে যারা সারাদিন - সারা সপ্তাহ বসে থাকেন তারা প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ। শনি-রবিবার অবশ্য অনেকেই আসতেন সপরিবারে। ইতালীয়দের অনেক কিছুই বাঙালিদের মতন (ভোজনরসিক, আড্ডাবাজ, ফুটবল-পাগল, খানিকটা অলস – দুপুরের ঘুমটা খুব ভালবাসে, পরিবারকেন্দ্রিক এবং মায়েরা বেশ কড়া ধাঁচের – প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েদেরও নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন)। খুব ভালো লেগেছে দেখে যে এরা এখনও আত্মীয়স্বজন-বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে প্রচুর সময় কাটায় আর তখন মোবাইল ফোনে ব্যস্ত থাকেনা।

ইতালির যে কোনো শহরের মতোই ত্রিয়েস্তে সৌন্দর্যে ভরপুর, ইতিহাসে ভরপুর এবং অবশ্যই সুখাদ্যে ভরপুর। নোবেল পুরস্কারজয়ী পাকিস্তানি বিজ্ঞানী ডঃ আবদুস সালাম ১৯৬৪ সালে এই শহরে International Centre For Theoretical Physics (ICTP) স্থাপন করেন। এই সংস্থাটি তৃতীয় বিশ্ব ও উন্নয়নশীল দেশের বিজ্ঞানচর্চায় খুবই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। ত্রিয়েস্তেতে তাই এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের মানুষের উপস্থিতি স্বাভাবিকভাবেই নজরে পড়ে। আই.সি.টি.পি.তে আসা বেশির ভাগ লোকজন অবশ্য আশপাশের চত্বরে থাকাই পছন্দ করেন। বছর দশেক আগেও শহরে বসবাসকারীদের মধ্যে অ-ইউরোপীয় লোকজন বিশেষ ছিল না। এখন বেশ কিছু দোকান চিনারা ও তুর্কীরা চালায়। এদের ছেলেমেয়েরা স্থানীয় স্কুলে পড়ে। বেশ কয়েকটি বাংলাদেশি পরিবারও এখানের স্থানীয় বাসিন্দা। আমাদের দেশে যেমন যেখানে সেখানে শিবের থান দেখা যায়, ইতালিতে তেমনই এ-গলি সে-গলির ফাঁকে গীর্জা রয়েছে। অতি সাধারণ গীর্জারও ভেতরের সাজসজ্জা খুব সুন্দর। আর সেখানে যখন ঘন্টা বাজত মনে হত স্বর্গে পৌঁছে গেছি। কিছুটা লম্বা সময় ধরে থাকায় ত্রিয়েস্তের বহু জায়গাতেই একাধিকবার ঘুরে বেড়িয়েছি। নতুন কিছু দেখার তাগিদে ইন্টারনেটে খুঁজে দেখি রিসিয়েরা দি সান সাব্বা - ইতালির একমাত্র নাৎসি কনসেনট্রেশন ক্যাম্প। জায়গাটি এখন মিউজিয়ামে রূপান্তরিত হয়েছে। এক সপ্তাহান্তে বাস ধরে পৌঁছলাম সেখান। সৌভাগ্যবশত বাসে এক পাকিস্তানি ভদ্রলোক ছিলেন, যিনি দীর্ঘদিন আই.সি.টি.পি.-র সঙ্গে যুক্ত। সঠিক জায়গার হদিশ দিলেন তিনিই। নাহলে মুশকিলে পড়তাম; কারণ স্থানীয় মানুষেরা এই মিউজিয়ামের খবর একেবারেই রাখেনা। ১৯৪৩-৪৫ সালের মধ্যে ঘটে যাওয়া ভয়ঙ্কর অপরাধগুলোকে ভুলে থেকেই এরা অস্বীকার করতে চায়।

১৮৯৮ সালে তৈরি এই চালকলকে (Risiera Rice husking mill) কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পরিণত করে জার্মানরা, মুসোলিনির সাহায্যে ও আনুকূল্যে। যদিও এটিকে মূলতঃ ট্রানসিট ক্যাম্প হিসেবে ব্যবহার করা হত (বেশীরভাগ বন্দীকেই এখান থেকে Dachau বা Auschwitz-এর ক্যাম্পে পাঠানো হত), চার হাজারেরও বেশি বন্দীকে এখানে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৪৫ সালের এপ্রিলে পালিয়ে যাওয়ার সময় জার্মানরা ডিনামাইট দিয়ে ক্যাম্পটি উড়িয়ে দিয়ে যায়, নিজেদের কুকর্মের প্রমাণ ধ্বংস করার জন্য। পুরো ক্যাম্প চত্বরটা এতটাই ছোট যে পনেরো মিনিটেই একবার ঘুরে ফেলা যায়। অথচ আমরা এক পা-দু'পার বেশি এগোতে পারছিলাম না। বন্দীদের ওপর অত্যাচারের বর্ণনা পড়ে এক অসহ্য দম বন্ধ করা কষ্ট হচ্ছিল। অসম্ভব ছোট ছোট খুপরিতে চল্লিশ-পঞ্চাশজনকে ঠেসে ঢোকানো হত। এছাড়াও শারীরিক-মানসিক নির্যাতনের নানা পন্থাতো ছিলই। একটি ছোট ছেলের লম্বা ডোরা দেওয়া পোশাক (Boy with the striped pajamas ফিল্মে অনেকেই হয়তো দেখেছেন) দেখে আমার ছেলে বলল, " এই ছেলেটা হয়ত আমার বয়সীই ছিল!" রিসিয়েরা মিউজিয়াম দেখে ও এতটাই হতভম্ব হয়ে গেছিল যে ওর খুব প্রিয় কাজ ছবি তোলার কথাও ভুলে গেছিল। কনসেনট্রেশন ক্যাম্প বলতে আমরা মূলতঃ ইহুদী-নিধন বুঝি। কিন্তু ইউরোপের বিভিন্ন ক্যাম্পে হাজার হাজার এথনিক স্লাভ, ক্রোয়েশীয়, পোলিশ ও রোমানীয় জিপসিদের হত্যা করা হয়েছে। রিসিয়েরার কয়েদীরা বেশিরভাগই ছিল স্লাভ ও ক্রোয়েশীয় - লেখক বরিস পাহর (এঁর বিখ্যাত উপন্যাস Necropolis) তাদের মধ্যে একজন। পরবর্তীকালে ইহুদীরা (বকলমে ইজরায়েল) সমস্ত কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের ওপর নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু স্লাভরা রিসিয়েরার অধিকার পুরোপুরি ছাড়তে রাজি হয়নি। মিউজিয়ামটি বর্তমানে ইতালি সরকারই দেখাশোনা করে। সমস্ত তথ্য ইতালীয়, ইংরাজি ও স্লাভ ভাষায় লেখা (বাকি সব ক্যাম্পে হিব্রুতে লেখাও আবশ্যিক)। রিসিয়েরায় যুদ্ধকালীন যে অপরাধ হয়েছিল তার বিচার শেষ হয় ১৯৭৬ সালে। বিচারের নামে প্রহসনই বটে! অপরাধীদের কাউকেই ইতালিতে আনা যায়নি। প্রায় সবারই স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। একজন অপরাধী (জোসেফ ওবেরহাউসের) তখনও মিউনিখে মদ বেচে চলেছে। বিচারে তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। কিন্তু ইতালি ও জার্মানির মধ্যে বন্দী প্রত্যর্পণ চুক্তি ১৯৪৮ সালের ঘটে যাওয়া অপরাধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; কাজেই ......।

রিসিয়েরা দেখার অভিজ্ঞতা আজও আমাকে যন্ত্রণা দেয়। ইতিহাস আমাদের দেখিয়েছে মানুষ মানুষকে কতটা আঘাত করতে পারে, মনুষ্যত্বের কতটা অবমাননা হতে পারে। সেটা সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে কী ভীষণ ক্ষতিকর! তবু মানুষ বারবার ভুল করে। নৃশংস আক্রমণের হাত থেকে স্কুল-হসপিটালও ছাড় পায়না। স্কুলে পড়তে গিয়ে বাচ্চারা আর বাড়ি ফিরে আসেনা। বোমার আঘাতে নিহত শিশুদের দেহে মর্গ উপচে পড়ে, দেহ রাখতে হয় আইসক্রীমের ফ্রিজারে। একজন মা হিসেবে নিজেকে তখন খুব অসহায় মনে হয়। তাই আজ আলো ঝলমলে রোম-ভেনিস সরিয়ে রেখে রিসিয়েরার অন্ধকার কুঠুরির গল্পটাই বললাম; এই আশায় যে একদিন এই ঝড় থেমে যাবে। "You may say I'm a dreamer. But I'm not the only one"।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার -
www.risierasansabba.it/english/

~ ত্রিয়েস্তের আরো ছবি ~

মফস্বল শহর বালীতে বড় হয়ে ওঠা কাকলি সেনগুপ্ত পশ্চিমবঙ্গ ছেড়েছেন ১৯৯৭ সালে। তারপর নানা জায়গা ঘুরে ২০০৪ সাল থেকে থিতু হয়েছেন গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে - এলাহাবাদে। গল্প করে ও গল্প বলে লোকজনকে বিরক্ত করার জন্য খ্যাতি আছে। বেড়ানোর সাথে সাথে দেশ-বিদেশের খাদ্য ও পানীয়ের বিষয়েও সমান আগ্রহী।

কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

কানাডার তুষাররাজ্যে কয়েকদিন

অয়ন চৌধুরী

"ল্যাণ্ড অফ ম্যাপল লিফ" বা কানাডায় পা রেখেছি প্রায় বছর দুয়েক হল। কানাডা বলতে প্রথমেই মনে পড়ে নায়াগ্রা জলপ্রপাতের কথা। না, আজ নায়াগ্রার গল্প বলব না। আজ যে জায়গার অভিজ্ঞতার কথা লিখব, সেটা নায়াগ্রার মত প্রচার আর জাঁকজমকতায় ঢেকে যায়নি। প্রায় সাড়ে সাত হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে কানাডার সবচেয়ে পুরনো এই Algonquin Provincial Park - পাইন আর ম্যাপলের জঙ্গল, ছোট পাহাড় আর অসংখ্য লেক নিয়ে তৈরি। এখানে যদিও লোকজন অক্টোবর-নভেম্বর মাসে ম্যাপল পাতার বর্ণময় রং দেখতে আসে, আমরা গেছিলাম নেহাতই অ্যাডভেঞ্চারের নেশায়। এই বছর অর্থাৎ ২০১৪-তে কানাডার ভয়ঙ্কর শীতের কথা হয়ত অনেকেই জানেন, এমনকী নায়াগ্রাও জমে গেছিল এবছরের ঠাণ্ডায়। সেই শীতকে চ্যালেঞ্জ করা অভিজ্ঞতার কথা আমি ডায়েরি থেকে তুলে ধরছি...

আমরা সাতজনের দলে বেরিয়ে পড়েছিলাম, সবাই একই ইউনিভার্সিটিতেই পড়ি এবং কয়েকজন একই পর্বতারোহণ ক্লাবের সদস্যও। উদ্দেশ্য ছিল তিন দিন ট্রেক করে -২৫ ডিগ্রির নীচে সেই ঘন জঙ্গলের ভিতর তুষার রাজ্যে তাঁবু খাটিয়ে থেকে একটা অপ্রচলিত রুট অতিক্রম করা। অনন্যসাধারণ এক ভয়ঙ্কর সুন্দর এবং রোমহর্ষক অভিজ্ঞতার শরিক হওয়ার জন্যই। আমি ছাড়া সবাই অবশ্য ইউরোপিয়ান। রওনা দেওয়ার কয়েকদিন আগে সব পরিকল্পনার ছক তৈরি হল। এই ধরনের অ্যাডভেঞ্চারে যেতে গেলে নিজেদের মধ্যে ভালো বোঝাপড়া খুব দরকার, আর দরকার অবশ্যই মানসিক আর শারীরিক জোর।

জমা লেকের ওপর সবাই মিলে, ক্যাম্প ছেড়ে বেরোনোর আগে তোলা

শীতের পোশাক বেশ ভালই দরকার ছিল -তিন-চারটে স্তর, তার সঙ্গে স্নো-বুট, বিশেষ ধরনের জ্যাকেট, স্নো-ট্রাউজার, এছাড়া স্লিপিং-ব্যাগ, রুকস্যাক তো আছেই। একটা সাধারণ সানগ্লাস নিয়ে নিলাম স্নো-ব্লাইন্ডনেস এড়াতে। উচ্চ ক্যালরি সম্পন্ন খাবার দাবার সঙ্গে নেওয়াটা খুব জরুরি ছিল। নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিলাম কে কী নেবে। ঠিক হলো প্রাতরাশ, এবং রাতের খাবার আমার গ্রুপের দুজন আনবে, আমি নিয়ে যাব পর্যাপ্ত পরিমাণ হট-চকলেট, চা, কফি, চকলেট। দুপুরের খাবার সবাই নিজেরটা নিজে। আমি বেশ কিছু বার্গার, চীজ, হ্যাম, আমন্ড, আপেল, ডিমসেদ্ধ, কলা এই সব নিয়ে নিলাম। সারা বছর ভেতো বাঙালি হয়ে থাকলেও এই কদিন একটু খাবারের অভ্যেস পাল্টাতে হবে। অতিরিক্ত জামাকাপড় বলতে একটা জিন্স, উলের সোয়েটার, গরম মোজা নিলাম, এতেই বেশ ভারি হয়ে গেল স্যাক, পনেরো কেজির মত হবে।

৭ ফেব্রুয়ারি, সকাল ১০.৩০ - আগের দিন রাতে রুকস্যাক গুছিয়ে রেডি করে রেখেছিলাম, শুধু সকালে উঠে কিছু খাবার-দাবার ভরে নিয়েছি। আমাদের গাড়িতে আমরা চারজন - আমি, সিয়ান, এমিলিয়া আর ক্যাটি। বাকীরা অন্য গাড়িতে, আমরা ওখানে পৌঁছে মিট করব। বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় কিছু হালকা প্রাতরাশ সেরে নিলাম, লাঞ্চ রাস্তায় করা হবে এই রকমটাই ঠিক ছিল। সবাই আসার পর মালপত্র গাড়ির পিছনে তুলে আমরাও উঠে পড়লাম। কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছে গেলাম উত্তর আমেরিকার সবচেয়ে ব্যস্ততম হাইওয়েতে, ৪০১ নম্বর। আপাতত ঘন্টা পাঁচ-ছয়-এর রাস্তা, আমরা টরন্টোর ওপর দিয়েই যাব।

Algonquin area, বিকেল ৫টা, আমরা এসে পৌঁছেছি একটু আগে। একটা ছোট বরফের ময়দানের ওপর গাড়ি পার্ক করিয়েছি, যার পাশ থেকে ট্রেইল শুরু হয়েছে পাইনের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। চারিদিকে শুধু বরফের রাজত্ব, পাশেই একটা লেক জমে বরফ হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ আগে থেকে তুষারপাত শুরু হয়েছে, সঙ্গে কনকনে ঠাণ্ডা। গাড়ির তাপমাত্রা-সেন্সর বলছে -২০ মত, উইন্ড-চিল -২৫ এর নীচে হবে। আমরা নেমে গাড়ি থেকে স্যাকগুলো বার করে স্নো-বুট, স্নো-ট্রাউজার সব পড়ে নিলাম, কারণ একটু পরই শুরু হবে আমাদের পথ চলা। কনকনে হাওয়ায় শরীর যেন কেটে নিচ্ছে, এক মুহূর্তের জন্যে গ্লাভস খুললে মনে হচ্ছে ফ্রস্ট-বাইট হয়ে যাবে। এখনই যদি এই অবস্থা হয় তাহলে আগামী তিন দিন কী হবে কে জানে, বেঁচে ফিরতে পারলে হয়!

ব্যাগ পত্তর গুছিয়ে গরম পোশাক পড়ে সবাই তৈরি হয়ে নিলাম। বরফের জুতোগুলোও পরে ফেললাম। এত বরফে হাঁটতে গেলে এটা অত্যন্ত জরুরি, তলায় ক্র্যাম্পন লাগানো থাকায়, ঢালে চলতে সুবিধা হবে। গাড়ি দুটোকে একদিকে পার্ক করিয়ে আমরা হাইকিং-এর প্রস্তুতি শুরু করলাম। তখন সন্ধে হবে হবে করছে, আমাদের প্রায় ৬-৭ কিমি মত যেতে হবে ক্যাম্প-১ পৌঁছতে গেলে। সুতরাং রাত হয়ে যাবেই। যে যার হেড-টর্চ রেডি করে রাখল। আমি ভুল করে সাধারণ টর্চলাইট এনেছি, সেটাই বের করে পকেটে রাখলাম। বিকেল ৫.৩০ নাগাদ আমরা হাঁটা শুরু করলাম। প্রথমের দিকে রাস্তা মোটামুটি ভালই ছিল, কিন্তু যত গভীরে ঢুকতে শুরু করলাম, ততই বরফের ঘনত্ব বাড়তে লাগল, চলাও কষ্টকর হতে শুরু করল। সঙ্গে অবিশ্রান্ত স্নো-ফল আর ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা। আস্তে আস্তে দিনের আলো ফুরিয়ে রাতের অন্ধকার গোটা জঙ্গলকে গ্রাস করল। আপাতত শুধু হেড-টর্চের আলো, বরফের ওপর চলার মচ-মচ আওয়াজ, জঙ্গলের গভীর থেকে আরও গভীরে এগিয়ে যাওয়া। রাস্তা কখনও চড়াই, কখনো উতরাই, চারদিকে শুধু সাদা আর সাদা...

ক্যাম্প-১, রাত ১১টা - প্রায় ৫-৬ ঘন্টার বিরামহীন পথ চলার পর আমরা অবশেষে পৌঁছেছি। বেশিরভাগ রাস্তাটাই হেঁটেছি অন্ধকারে। বরফের ঢালে নামার সময় মাঝেমধ্যেই পা হড়কেছে সবারই। আমিও একবার আছাড় খেয়েছি। সবচেয়ে মুস্কিলের ব্যাপার হল উঠে দাঁড়ানো, চারিদিকে শুধু নরম বরফ,

ধরার কিছুই নেই, ওই অবস্থায় ১৫ কেজি নিয়ে উঠে দাঁড়ানোটা খুব কষ্টকর। নরম বরফের ওপর দিয়ে ঢালু জায়গায় চলা যে এত কষ্টকর আগে বুঝিনি। যতক্ষণ পথ চলার মধ্যে রয়েছি, ঠাণ্ডা সেভাবে বুঝতে পারছিলাম না, একটু থেমে গেলেই যেন সব হিমেল হাওয়া শরীরে এসে জড়ো হচ্ছে...
মাঝে একটা সময় আমরা বেশ কিছুক্ষণ জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়েছিলাম, আসলে সিয়ান তখন একটু পিছিয়ে পড়েছিল। নিশুতি রাতে বরফে ঢাকা জঙ্গলের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকার অনুভূতি ঠিক কীরকম সেটা প্রকাশ করার মত ভাষা আমার নেই। এমনটা হতেই পারত যে জঙ্গল থেকে হঠাৎ কোনো ভালুক বা বুনো জানোয়ার বেরিয়ে এল! অথচ সেই মুহূর্তে কী অদ্ভুত একটা প্রসন্নতা গোটা জঙ্গল জুড়ে, শুধু আমরাই যেন সেই শান্ত অরণ্যের কোন অংশ নই। বিভূতিভূষণের আরণ্যকে চাঁদনি রাতে জঙ্গলের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, সেই অভিজ্ঞতা আমার হয়নি, কিন্তু আমার কাছে স্বর্গ বলতে আজকের এই রাতটা। এখানে লবটুলিয়ার জঙ্গলে চাঁদনি রাতে ঘোড়া ছুটিয়ে যাওয়ার সময় শুকনো পাতার মচ-মচ শব্দ নেই, কোয়েল নদীর অববাহিকায় পূর্ণিমা রাতে জঙ্গলের বুনো আওয়াজ নেই, এখানে চারিদিকে যেটা আছে তা হল মৃত্যুর হিমশীতল জগত, আর তার অপার সৌন্দর্য। Life is what you make it - দশটা-পাঁচটা করা বাঙালির জীবন সুখের হতে পারে, কিন্তু তাহলে প্রকৃতির এই রূপ দেখা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আর তাছাড়া আমিও তো এই বন্য প্রকৃতিকে আমার কল্পনার প্রেমিকার শরীরের মতই কামনা করি।

পাইন আর ম্যাপলের জঙ্গলের মধ্যের এই রাস্তা দিয়েই আমরা আগের দিন রাতে এসেছি

ক্যাম্প-সাইটে পৌঁছে প্রথমেই দুটো কাজ সবচেয়ে জরুরি ছিল - আগুন জ্বালানো আর তাঁবু খাটানো। এই বরফের রাজত্বে শুকনো কাঠ খুঁজে বের করা বেশ দুরূহ ব্যাপার। সবাই মিলে অল্পসল্প করে মোটামুটি বেশ কিছু জ্বালানি সংগ্রহ করা হলো। খানিক সমতল একটা জায়গা তাঁবুর জন্যে বাছা হল - পাশাপাশি দুটো তাঁবু লাগানো হবে। আমাদের কাছে একটা কোদাল ছিল, সেটা দিয়ে প্রথমে যতটা সম্ভব নরম বরফ সরিয়ে ফেলে জায়গাটাকে দুরমুশ করতে লাগলাম সবাই মিলে, যাতে সমতল জমি পাওয়া যায়। একে ঠাণ্ডায় হাত-পা জমে যাচ্ছে, তার ওপর গ্লাভস খুলে তাঁবুর দড়ি লাগানো প্রায় অসম্ভব কাজ। এরমধ্যে আবার তাঁবু খাটানোর লাঠিগুলো বরফের স্তর ভেদ করে শক্ত জমি অব্দি পৌঁছাচ্ছেনা, তাই ভালো করে আটকানোও যাচ্ছেনা। ওই ভাবেই কোনরকমে দুটো তাঁবু খাটানো হল পাশাপাশি। হাওয়া ঢোকা বন্ধ করতে তাঁবুর চারপাশ বরফের পাঁচিলের মত তুলে দিলাম বেলচা দিয়ে বরফ সরিয়ে। এইসব করতে করতেই অনেক রাত হয়ে গেল, কত রাত জানিনা। ইতিমধ্যে দেখি রেগি বেশ কায়দা করে আগুন জ্বালিয়ে ফেলেছে। বিখ্যাত অ্যাডভেঞ্চারার বিয়ার গ্রিলস-এর একটা কথা মনে পড়ছিল, এক্সট্রিম সারভাইভাল-এর ক্ষেত্রে আগুন জ্বালাতে পারলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায় - সত্যিই তাই! আগুনের কাছে গিয়ে একটু গরম হয়ে নিলাম সবাই। কিন্তু এদিকে পেটে তখন আগুন জলছে। পথে আসতে আসতে টুকটাক কিছু খাওয়া হলেও যে পরিমান ক্যালরি খরচ হয়েছে সেটা কিছুই নয় সেই তুলনায়। আর সবচেয়ে বেশি দরকার জীবনদায়ী জল, নাহলে ডিহাইড্রেটেড হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এমনিতেই পথে আসার সময় বোতলগুলো ঢাকা সমেত জমে যাওয়ার ফলে জল থাকা সত্ত্বেও খেতে পারিনি, সেগুলো খুলতে আগুনের কাছে নিয়ে গিয়ে অনেক কসরত করতে হয়েছে। জল বলতে বরফ গলানো, তাই এক পাত্র নরম বরফ ভরে মিনি-স্টোভে চাপিয়ে দেওয়া হল, আর একটা পাত্রে রান্না। প্রথম দিনের ডিনারের জন্যে এমিলি এনেছিল মিট অ্যান্ড সস, সেটা গরম করে নেওয়া হল। বরফ গলে জল হয়ে ফুটতে শুরু করলে সবাই নিজের নিজের বোতল ভরে নিলাম। শরীরের সংস্পর্শে বোতলগুলো রাখলাম, নাহলে সব জমে যাবে। এদিকে ক্যাম্প-ফায়ার জ্বালানো হল ঠিকই, কিন্তু অবিরাম স্নো-ফলে আগুন টিকিয়ে রাখাই দায়, তারজন্য আরও শুকনো কাঠ দরকার । নিশুতি রাতে জঙ্গলে ঢুকে কাঠ সংগ্রহ করাও একটা ছোট-খাটো অ্যাডভেঞ্চার বৈকী, বরফে প্রায় কোমর পর্যন্ত ঢুকে যাচ্ছি! শরীর গরম রাখতে এক কাপ হট-চকলেট খেয়ে নিলাম শুতে যাওয়ার আগে, আর আমাদের খাবারদাবারগুলো দড়ি দিয়ে গাছের উঁচু ডালে টাঙিয়ে দেওয়া হল, যাতে বন্য জন্তু নাগাল না পায়। শুতে গিয়ে দেখি আমার স্লিপিং-ব্যাগের এর টেম্পারেচর লিমিট -২০ ডিগ্রি, আর বাইরে ঠাণ্ডা মোটামুটি -২৫ এর নীচে, ভাগ্যিস একটা ফ্লিস লাইনার এনেছিলাম, এটা আরো ১০-১২ ডিগ্রি মত আরাম দেবে। শুধু ভারি জ্যাকেট, স্নো-ট্রাউজার আর স্নো-বুটটা কোনরকমে খুলে সটান স্লিপিং-ব্যাগের ভিতর। সকালে কী করে উঠব সেই চিন্তা করতে করতেই সারাদিনের ক্লান্তিতে কখন চোখটা লেগে গেল...

সারা রাতের তুষারপাতে সব ঢেকে গেছে, টেন্টটাও নুইয়ে পড়েছে বরফের ভারে

৮ই ফেব্রুয়ারি, সকাল আন্দাজ ৮টা - আমার ঘুম ভাঙ্গল সবার আগেই, কিন্তু কিছুতেই আর স্লিপিং-ব্যাগ ছেড়ে বেরোতে পারছিনা। কোনরকমে উঠে জ্যাকেট, স্নো-বুট পরে বাইরে এলাম। বেরিয়েই দেখি অদ্ভুত সব দৃশ্য চারপাশে! কাল রাতে অন্ধকারে ভালো করে বুঝতে পারিনি। যে দিকে চোখ যায় শুধু পাইনের জঙ্গল সাদা বরফের চাদরে মোড়া, বরফের ভারে পাইনের ডালগুলো বৃদ্ধ মানুষের মত ঝুঁকে পড়েছে। আর ঠিক আমাদের ক্যাম্পের পাশেই বিশাল লেকটা জমে বরফ হয়ে গেছে। সকালের সোনালি রোদ এসে পড়েছে সাদা বরফের প্রান্তরে, অদ্ভুত এক নিঃশব্দতা যেন জমে উঠেছে চারদিকে। এই রূপও এভারেস্টের মেদহীন রাজসিক রূপ, অথবা পূর্ণ যৌবনা কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপের চেয়ে কম কিছু না। একে মৃত্যুপুরী না স্বর্গলোক কী বলব জানিনা, কারণ এখানে যেমন অপার্থিব সৌন্দর্য আছে, তেমনি এই প্রকৃতি জীবন কেড়ে নিতেও পারে যখন তখন।
প্রকৃতির একেবারে কাছাকাছি চলে এসে নিজেকে পৃথিবীর রাজা মনে হচ্ছিল তখন। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় হাত-পা জমে যাচ্ছে, অথচ কিছুতেই চোখ ফেরাতে পারছিনা ওই বরফের ময়দান থেকে। কাল রাতের বেলায় যে পথ পেরিয়ে এসেছি, সেই দিকে একটু এগিয়ে দেখি সরু শুঁড়ি পথের মত রাস্তা চলে গেছে পাইনের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। আমাদের চলার রাস্তাটা বোঝা যাচ্ছে। চারদিকে শুধুই বরফ, পা দিলেই হাঁটু অব্দি ঢুকে যাচ্ছে। আমাদের টেন্ট দুটোও সাদা বরফের চাদরে মুড়ে গেছে সারারাতের তুষারপাতে, বাইরে রাখা স্যাক, জুতো সব বরফে ঢেকে গেছে। এই অদ্ভুত পরিবেশটাকে মনের ভিতর তো ধরে রাখলামই, ক্যামেরার লেন্সে বন্দী করতেও ভুললাম না। ভাগ্যিস তিনটে ব্যাটারি ছিল, এই ঠাণ্ডায় খুব তাড়াতাড়ি চার্জ শেষ হয়ে যাচ্ছে।
কিছুক্ষণ পর সিয়ান উঠল, আর একটু পর বাকী সবাই। প্রথমেই বরফ গলিয়ে জল তৈরি করা হল সবার জন্যে, তারপর প্রাতরাশে ওটমিল, ডিমসেদ্ধ (জমে পাথর হয়ে গেছিল, দাঁতে করে ভেঙ্গে খেতে হয়েছে), এলমন্ড, সসেজ, আপেল আর হট-চকলেট। একটু ভারি খেয়ে নেওয়া হলো কারণ আজ প্রায় ১০-১১ কিমি হাইক করতে হবে এবং লাঞ্চ হবে রাস্তায় যেতে যেতে টুকিটাকি খেয়ে। কিছুক্ষণের মধ্যে সবাই তৈরি হয়ে তাঁবু গুটিয়ে নিয়ে রওনা দিলাম। আজও সকাল থেকে তুষারপাত শুরু হয়েছে, জানিনা কখন থামবে।

দিনের বেলায় একটা সমস্যা হল যেটা কাল রাতে বুঝতে পারিনি, ঘাম হতে লাগল ওই প্রবল ঠাণ্ডার মধ্যেও, কারণ রাস্তা বেশ চড়াই এবং আমরা ভালই ওজন বহন করছি। একটু দাঁড়ালেই আবার খুব শীতও করছিল। ঘাম বসে যাওয়াও খারাপ জিনিস, অথচ জ্যাকেট খুলতেও পারছিনা ঠাণ্ডা লেগে যাওয়ার ভয়ে। এইভাবেই তুষারপাতের মধ্যে দিয়ে চলতে লাগলাম, আর মাঝে মাঝে একটু জিরিয়ে নেওয়া। পকেটে কিছু আমন্ড, লজেন্স রেখেছিলাম পথ চলতে খাওয়ার জন্যে। আমার দু-পকেটে দুটো জলের বোতল, পিঠে ভারি রুকস্যাক, চলতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। জল জমে যাওয়া রুখতেই এই পন্থা। রাস্তায় যাবার পথে অদ্ভুত সব দৃশ্য, সুযোগ পেলেই ক্যামেরাবন্দী করছি। জটায়ুর ভাষায় বলতে গেলে, রুদ্ধশ্বাস, মুগ্ধভাষ, বিমুগ্ধ বিমূঢ় বিস্ময়! মাঝে একটা বেশ চড়াই এল, সেটা পেরিয়ে একটু সমতল আর খোলা মত জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি, তুষারপাতের তীব্রতা গেল বেড়ে। অদ্ভুত লাগছিল তখন - চারদিক পেঁজা তুলোর মত বরফ সবাইকে সাদা করে দিচ্ছে, কাছাকাছি আমরা ছাড়া আর কোনও জনমানব নেই।

প্রায় ঘন্টা পাঁচ-ছয় ওই ভাবে পথ চলেছি, দেখতে দেখতে সূর্য ডোবার সময় হয়ে এল, বেলা প্রায় পড়ে এসেছে। শরীরও বেশ ক্লান্ত। সারাদিনে সেভাবে কিছু ভারি খাবার খাইনি, বেশ খিদে পেয়ে গেছিল। খাবার দাবার সব স্যাকের ভিতর, রাস্তায় চলার সময় বের করে খাওয়ার সুযোগ হয়নি। বাকীরা একটু এগিয়ে গেলে ব্যাগ থেকে হ্যাম-বার্গার বের করে খাওয়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু হ্যামগুলোও জমে গেছে। কোনও রকমে বের করে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলাম, কারণ হাত একটু খোলা রাখলেই জমে যাচ্ছে। তারপর আবার চলা শুরু। বেশ কিছুক্ষণ আমি একা পথ চলছি, একটাই ভয় লাগছে রাস্তা যদি ভুল করে ফেলি! যদিও সামনের বরফের ওপর সবার চলার পথ দেখা যাচ্ছে, কিন্তু আধো-আলো আধো-অন্ধকারে ভুল হবার সম্ভাবনা থেকেই যায়।

পথ চলা - ব্যাগপত্র রেখে আমরা অন্য একটা রাস্তার দিকে যাচ্ছি

তখন সন্ধে হয় হয়, গ্রুপ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি, শরীরটাও অবসন্ন। হঠাৎ বাড়ির কথা মনে হল, মায়ের কোলই মনে হয় পৃথিবীর সবচেয়ে উষ্ণ আশ্রয়। 'ইন টু দ্য ওয়াইল্ড' সিনেমাটার কথা মনে হচ্ছিল বারবার, সত্যি যদি আমি আর না চলতে পারি, এখানেই হয়ত মৃত্যুর হিমশীতল জগতে চলে যাব। একবার যদি পাশে বরফের মধ্যে ঢুকে যাই, কেউ আর আমাকে খুঁজে পাবে না। এইসব আকাশ কুসুম ভাবতে ভাবতে শরীর দুর্বল লাগছিল। মনে জোর এনে আবার চলতে শুরু করলাম, কিছুক্ষণের মধ্যে গ্রুপে ফিরতে পেরে খানিক আশ্বস্ত লাগল। সবাই-ই অবশ্য ক্লান্ত। আজও আমাদের সন্ধে হয়ে গেল, এখনও অনেকটা রাস্তা বাকি। সময় বাঁচাতে ঠিক করা হল জমা লেকের ওপর দিয়েই যাওয়া হবে, যদিও সেটায় বেশ বিপদেরই সম্ভাবনা। সাত-পাঁচ না ভেবে প্রায় অন্ধকারের মধ্যেই আমরা নেমে পড়লাম জমে যাওয়া লেকের ওপর। কোনও কথা নেই, শুধু সাতটা ছায়ামূর্তি নিঃশব্দে মচ-মচ শব্দ করে পেরিয়ে যাচ্ছি লেকটা আড়াআড়িভাবে। অবশেষে এসে পৌঁছলাম ক্যাম্প-২, তখন সবার শরীর প্রায় অবসন্ন। কিন্তু তার মধ্যেও চারপাশের সৌন্দর্য নজর কাড়ে, এই জায়গাটা যেন আগের ক্যাম্পের চেয়েও সুন্দর, যদিও এখন অন্ধকার। আজ তাঁবু দুটো একটু দূরে-দূরে লাগানো হল সমতল জায়গার অভাবে। বেশি জ্বালানি পাওয়া যায়নি, আর স্নো-ফলের জন্যে ভালোভাবে আগুনও জ্বালানো যায়নি। কোনরকমে তাঁবু খাটিয়ে ভিতরে বিছানা তৈরি করে নিলাম, যত তাড়াতাড়ি শুয়ে পরা যায় ততই মঙ্গলের, আর শরীর টানছে না। ঝটপট রান্না করে ফেলা হল পাস্তা দিয়ে। কোনরকমে খেয়ে সটান স্লিপিং-ব্যাগে। জায়গাটা ভালো করে সমান করা হয়নি, পিঠে উঁচু-নীচু বরফ লাগছে। আজ ঠাণ্ডা আরও বেশি, মাথা অব্দি ঢেকে দিয়েও শীত করছে। বেশি শীত করার আর একটা কারণ হচ্ছে আমাদের স্লিপিং প্যাড-এও বরফ জমে আছে, অন্ধকারে সব গুছাতে গিয়ে বরফময় হয়ে গেছে। সারভাইভাল-এ রাতগুলোই সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং...

আমাদের টেম্পোরারি কিচেন

৯ই ফেব্রুয়ারি, সকাল ৮:৩০ - ঘুম থেকে উঠেই সেল-ফোনটা অন করে সময় দেখলাম, প্রায় সাড়ে-আটটা বাজে। উঠেই আবার লড়াই, আজ আর একটা সমস্যা হল, আমার স্নো-বুট জমে গেছে, কিছুতেই পড়তে পারছিনা। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় গলালাম পায়ে, জ্যাকেটটাও যেন জমে কাঠ। তবে জলের বোতল দুটো সঙ্গে নিয়ে শুয়েছিলাম বলে একেবারে ঠিক আছে। বাইরে বেরিয়ে আবার একটা অসাধারণ সকাল, এ যেন এই পৃথিবীর বাইরে কোথাও। আজ সবাই উঠে পরেছে, আমাদের তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে, নাহলে সময়ে পৌঁছাতে পারবনা। ব্রেকফাস্ট করে নেওয়া হল, আমার নিয়ে আসা কলা, ডিমসেদ্ধ কোনও কাজে এলো না, কারণ সব কিছুই জমে পাথর হয়ে গেছে। স্যান্ডুইচ আর হট-চকলেট দিয়ে প্রাতরাশ সারলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে তৈরি হয়ে বেরিয়ে পরলাম শেষ গন্তব্যের দিকে, অর্থাৎ ফেরার পথে। আজ আমরা ৬-৭ কিমি মত হাইক করব, এবং আবার সেই রাস্তায় গিয়ে মিশব যে রাস্তা দিয়ে প্রথম দিন এসেছিলাম। আজও সকাল থেকে তুষারপাত হচ্ছে, তার মধ্যে দিয়েই আগের মত পথ চলা। একটা জায়গায় এসে দেখি রাস্তা দু ভাগে ভাগ হয়ে গেছে, একটা চলে গেছে সোজা, আর একটা নীচের দিকে। ব্যাগপত্র রেখে আমরা নীচের রাস্তা দিয়ে কিছুটা এগিয়ে গেলাম কৌতুহলবশত। বেশ কিছুটা চড়াই উতরাই কাটিয়ে একটা ছোট পাহাড়ের মাথায় এসে দেখি এক অভাবনীয় দৃশ্য, গোটা লেক অঞ্চলটা নীচে দেখা যাচ্ছে, সব সাদা হয়ে আছে, মাঝে শুধু পাইন গাছের সারি, আর আমরা ওপরে। ঠিক ছবিতে বা ক্যালেন্ডারে যেমন দেখি। ওখানে আমরা মিনিট দশ-পনের ছিলাম।

ফিরে এসে আবার পথ চলা, মাঝে অল্প বিরতি। একটা জায়গায় ছোট সেতু মত পড়ল, জায়গাটা খুব সুন্দর। বরফের প্রান্তরের মাঝে একটা জায়গায় ছোট্ট ফুটো, সেখান দিয়ে কল-কল করে জল বয়ে চলেছে। আমাদের পায়ের কয়েক ইঞ্চি নীচেই বয়ে চলেছে সেই হিমশীতল জলের ধারা। সেসব পেরিয়ে আমরা কয়েক ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে গেলাম যেখান থেকে এই হাঁটা শুরু হয়েছিল, তখন বিকেল তিনটে।

সবাই মিলে সেলিব্রেট করা হল। অদ্ভুত ভাবে তিনটে দিন কেটে গেল স্বপ্নের মত। এবার ফেরার পালা, যে যার কাজে আবার জড়িয়ে পড়বে, শুধু থেকে যাবে মাঝের এই কয়েকদিনের স্মৃতি। রাস্তায় আসার সময় একটা জায়গায় সবাই মিলে খাওয়া দাওয়া হলো, তারপর একে অপরকে বিদায় জানিয়ে ফিরে আসা যে যার জগতে। হয়ত এদের সঙ্গে এখান থেকে চলে যাবার পর কোনদিন দেখাও হবেনা, কিন্তু এই তিনদিনের স্মৃতি থেকে যাবে চিরকাল। হয়ত কোনও এক শীতের বিকেলে কলকাতার ময়দানে লেবু-চা বা কফি হাউসে কোল্ড-কফি, কাটলেট নিয়ে বসে ড্যানিয়েল, সুকান্ত, বা শুভজিতের সঙ্গে গল্প করব এই সব অভিজ্ঞতা, একদিন হয়ত বলব "those were the best days of my life"...

জমে যাওয়া নদী - কয়েক ইঞ্চি নিচ দিয়েই বয়ে যাচ্ছে হিমশীতল জলের ধারা

ডানকুনির ছেলে অয়ন চৌধুরী বর্তমানে কানাডার ইউনিভার্সিটি অফ ওয়েস্টার্ন অন্টারিওতে পিএইচডি করছেন। প্রধান নেশা পর্বতারোহণ। এদেশে থাকতে দক্ষিণ কলকাতার একটি পর্বতারোহণ ক্লাবের সদস্য ছিলেন। পঠনপাঠনের সঙ্গে সঙ্গে ইউনিভার্সিটির ক্লাইম্বিং ক্লাবের সক্রিয় সদস্য অয়ন পর্বতারোহণের নেশাটা বজায় রেখেছেন বিদেশে গিয়েও। এছাড়াও ফটোগ্রাফি, ঘুরে বেড়ানো, ব্লগ লেখা তাঁর অবসর সময়ের আর্কষণ।

কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

বেড়ানোর কথা আর ছবি নিয়ে বাংলা ই-ম্যাগাজিন

= 'আমাদের ছুটি' বাংলা আন্তর্জাল ভ্রমণপত্রিকায় আপনাকে স্বাগত জানাই = আপনার বেড়ানোর ছবি-লেখা পাঠানোর আমন্ত্রণ রইল =

বেড়িয়ে এসে আপনার অভিজ্ঞতাগুলো যেমনভাবে শেয়ার করতে চান কাছের মানুষদের সাথে - ঠিক তেমনি করেই সেই কথাগুলো ছোট্ট করে লিখে পাঠিয়ে দিন ছুটির আড্ডায়। ছয় থেকে ছেষট্টি আমরা সবাই এই ছুটির আড্ডার বন্ধু। লেখা ডাকে বা ই-মেলে পাঠালেও চলবে। লেখা পাঠাতে কোনরকম অসুবিধা হলে যোগাযোগ করুন - admin@amaderchhuti.com

আশ্চর্য সরোবর মূলকারখা

প্রীতম সাহা

~ মূলকারখা লেক ট্রেকের আরও ছবি ~

উত্তরবঙ্গের পাহাড়ের পাদদেশে অরণ্যের গভীরে আছে এক আশ্চর্য প্রাকৃতিক সরোবর - মূলকারখা - যার টলটলে স্বচ্ছ জলে প্রতিদিন মুখ দেখে রূপসী কাঞ্চনজঙ্ঘা। গা ছমছমে অরণ্যের বুকের ভেতর দিয়ে, ২০০ ফুট উঁচু জলপ্রপাতের কোল ঘেঁষে পাহাড়ের গা বেয়ে প্রায় অনাস্বাদিত এই ট্রেকপথ। পথে যেতে যেতে ক্ষণে ক্ষণে মুগ্ধ হতে হয় কাঞ্চনজঙ্ঘার বিপুল সৌন্দর্যে। প্রাচীন বৌদ্ধ মনাস্ট্রির শান্ত-শুদ্ধ পরিবেশ যেন সময়কেও থমকে দেয় - আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যায় কোন সুদূর অতীতে। পথের ধারে ছবির মত দু'একটা ছোট পাহাড়ি গ্রাম, কতরকমের পাখি, প্রজাপতি আর রঙবেরং-এর ফুলের বাহার ভুলিয়ে দেয় পথের ক্লান্তি। স্থানীয় নাম 'ফুসরে লেক' - মানুষের কাছে বড় পবিত্র ইচ্ছেপূরণের এই সরোবর।

নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্লোরার ক্লাবের পক্ষ থেকে আমাদের একরাত-দুদিনের এই ছোট্ট অভিযান হঠাৎ করেই ঠিক হয়েছিল। ফলে সময়-টময়ের আন্দাজগুলোও ঠিকঠাক হয়নি। পাঠকদের জন্য আমার পরামর্শ আমাদের মতো একুশ ঘন্টার জলদি সফর না করে অন্তত দুরাত-তিনদিন হাতে রাখা ভালো। সময়ের অভাবে দেখা হয়নি অনেককিছুই। খুব কঠিন নয় এই ট্রেক, যাওয়া-ও যায় নানাভাবেই। আমরা লিংসে, পিতমচেন হয়ে মূলকারখা গিয়েছিলাম। লিংসে আর মূলকারখা পশ্চিমবঙ্গে হলেও পিতমচেন কিন্তু সিকিমের অন্তর্গত। মূলকারখার অবস্থানও একেবারে দু রাজ্যের সীমান্তেই। লিংসে থেকে মূলকারখা ছাড়াও একটা রাস্তা গেছে রেশি এবং অন্য আরেকটা পথ গেছে সিকিমের আরিতার-এ। আমরা রেশির পথ ধরে ফিরেছিলাম। এই পথেই ঝরনাটা পড়ে।
আমরা দুই অভিযাত্রী (আমি আর একজন সিনিয়র দাদা) শিলিগুড়ি থেকে নভেম্বরের এক বিকেলে রওনা দিয়েছিলাম দুচাকায়। সিকিমে ঢুকতেই ছ'টা বেজে গেল। রেনক পেরিয়ে লিংসে পৌঁছতে পৌঁছতে অন্ধকার নেমে এল। রাস্তায় কোন আলো নেই। ঘন অন্ধকারে বাইক চালানোর সিদ্ধান্তটা যে বেশ ভুলই হয়েছিল তা পাহাড়ি রাস্তায় বার দুয়েক উলটে পড়তেই আরও ভালোভাবে বুঝতে পারলাম। যাইহোক রাত সাতটা-সোয়া সাতটা নাগাদ লিংসে পৌঁছলাম।

তারপর একটা অপরূপ মায়াময় রাত লিংসেতে। ছোট্ট এই গ্রামটিতে দার্জিলিং জেলার দ্বিতীয় বৃহত্তম মন্দিরটি রয়েছে। মন্দির চত্ত্বরে শ্রাবণের ভোলে ব্যোম, শিবরাত্রি, দুর্গাপুজো, বাল চতুর্দশী এমন নানা উপলক্ষে বছরভর চলে উৎসবের পালা। লিংসেতে একটি সংস্কৃত বিদ্যালয়ও রয়েছে। এই বিদ্যালয়ের সংগ্রহে রয়েছে হিন্দু সংস্কৃতির ওপর লেখা বেশ কিছু দুষ্প্রাপ্য এবং দামী বইও। এছাড়াও উষ্ণ কুণ্ড, লেপচাদের ঘরবাড়ি এবং রাং বাং নদীও দ্রষ্টব্য এখানে। যদিও প্রথমদিন অন্ধকার এবং পরেরদিনের তাড়াহুড়োয় প্রায় দেখা হয়নি কিছুই। ইচ্ছে আছে কোনোদিন আবার ফিরে দেখার।
পরেরদিন সকালে সাতটা-সাড়ে সাতটা নাগাদ রওনা দিয়ে বাইকেই পিতমচেন পৌঁছলাম ন'টা-সাড়ে ন'টা নাগাদ। পিতমচেনের প্রাচীন মনাস্ট্রিতে রেনোভেশনের কাজ চলছে দেখলাম। সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কথা বলে মনাস্ট্রি চত্ত্বরে বাইক রাখার ব্যবস্থা করে হাঁটা শুরু করলাম। এই রাস্তা এত চড়াই যে এ পথে আর বাইক চালানো সম্ভবই নয়। ৫ কিলোমিটার হাঁটা পথের শেষে মূলকারখায় পৌঁছেছিলাম মোটামুটি বেলা বারোটা-সাড়ে বারোটা নাগাদ। আসলে চারপাশের অসহ্য সৌন্দর্য ভুলিয়ে দিয়েছিল ঘড়ির কাঁটাকে। সময়গুলো খানিক আন্দাজেই লিখলাম।
চারিদিক একেবারেই শুনসান। শুধু তীব্র বেগে বয়ে যাওয়া হাওয়ার শব্দ গাছেদের মাথায় মাথায়। মূলকারখার স্বচ্ছ জলে তরঙ্গ উঠছে - বারবার ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘার অপরূপ মুখচ্ছবি। জলের ধারে একা একা দাঁড়িয়ে একটা প্রাচীন মন্দির। মূলকারখা লেকের ধারে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হতে হতে শেষপর্যন্ত বুঝেছিলাম যে এই সৌন্দর্যের বর্ণনা দেওয়ার ভাষা আমার কলমে নেই। ...

[আমাদের চলার পথের রূপরেখা - প্রথমদিন - বাইকে শিলিগুড়ি থেকে রংপো (দূরত্ব মোটামুটি ৮০ কিলোমিটার),রেনক (রংপো থেকে দূরত্ব মোটামুটি ৩০ কিমি) হয়ে লিংসে (রেনক থেকে মোটামুটি ৬/৭ কিমি)। দ্বিতীয়দিন বাইকে লিংসে থেকে পিতমচেন (মোটামুটি ১০ কিমি), পিতমচেন থেকে মূলকারখা লেক (পায়ে হেঁটে মোটামুটি ৫ কিমি)। এদিন একই পথে শিলিগুড়ি ফিরে আসা। অবশ্যই এই দূরত্ব একেবারে স্কেল অনুযায়ী নয়। একটু-আধটু তফাত থাকবেই।]

পুনশ্চ - পাঠকদের সাবধান করি - বাইক চালালে অবশ্যই এক বা একাধিক আরোহীর সকলেই হেলমেট পড়বেন, সে শহর হোক আর পাহাড়। সিকিম হলে তো কথাই নেই, যেখানে সেখানে পুলিশ কিন্তু আপনাকে গ্রেপ্তার করতে পারে এর জন্য - আমিই ভুক্তভোগী কীনা!

অনুবাদ - দময়ন্তী দাশগুপ্ত

~ মূলকারখা লেক ট্রেকের আরও ছবি ~

ফটোগ্রাফিকেই পেশা করতে চান প্রিতম সাহা। শিলিগুড়ির বিশিষ্ট 'নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্লোরার্স ক্লাব'-এর সদস্য প্রিতম তাই ফটোগ্রাফি আর ভ্রমণের নেশায় বেরিয়ে পড়েন যখন তখন।

কেমন লাগল : - select -

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

হলং-এ এক রাত্রি

জয়ন্ত লাহা

হলং-এ সরকারি বনবাংলোর বুকিংটা ভাগ্যক্রমে পেয়েই গেলাম। জলদাপাড়া জঙ্গলের কিছুটা ভিতরে বনবাংলো। জঙ্গলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে চারপাশের পরিবেশ পালটে গেল। এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা যেন বিরাজমান। কাঠের বাড়ি আর সামনে দিয়ে তির তির করে বয়ে চলেছে ছোট্ট হলং নদী। তাতে জল বেশি নেই। পায়ে হেঁটেই যেন পেরনো যায়। নদীর ওপারে রাখা নুনের ঢিপি। ওখানেই নাকি বন্য জন্তুরা লবণ খেতে আসে। বাংলোয় পৌঁছে কাঠের ঘরে জিনিসপত্র রাখলাম। জঙ্গল আর তার নৈঃশব্দ্য তখন আমাদের ডাকছে। আমি আর ভাই ক্যামেরা নিয়ে হলং-এর ধারে গিয়ে বসলাম। নদীর ওপারে দেখি ছোট, বড়, মাঝারি নানারকম পাখির মেলা। জঙ্গলের একটা আলাদা প্রশান্তি আছে যেটা ভেতরে না গেলে ঠিক বোঝা যায় না। সেই শান্তি ভগ্ন করে হঠাৎ কয়েকটা পাখি উড়ে গেল এ ডাল থেকে ও ডালে। নুনের ঢিপির কাছে সবুজ গলার কয়েকটা পাখি। ওদের নাম ইয়েলো পিজিয়ন। দিব্যি নিজেদের মতই রয়েছে, যেন আমাদের দেখেও দেখছেনা। প্রকৃতির মাঝে আমরাই নেহাত বেমানান। চুপচাপ তাদের কাণ্ড-কারখানা ফ্রেম বন্দী করছি। একটু পরে চোখে পড়ল একটা ময়ূর। তার পেছনে আরও একটা ময়ূর দেখা দিল। ময়ূরেরা বেশ খানিকটা কাছে আসতেই আমাদের চোখ চলে গেল ক্যামেরার লেন্সে। কী অদ্ভুত সুন্দর তাদের গলা আর পেখম - নীল আর সবুজ রঙের যেন জোয়ার এসেছে।

জঙ্গলে সন্ধ্যা নামছে। জিপ সাফারির শেষে ফিরছে ট্যুরিস্টের দল। পাখিরাও নীড়গামী। আমরা নদীর ধার থেকে ফিরে বাংলোর ক্যান্টিনে এসে বসলাম। সান্ধ্য চায়ের আশায়। চা-স্ন্যাকস খেয়ে ঘরে ঢোকার মুখে চোখে পড়ল দেওয়ালে - তক্ষকের শাবক। লাল চোখ করে তাকিয়ে আছে। বাংলোর কর্মচারীরা বললেন জংলি টিকটিকি। সন্তর্পণে পাশ কাটিয়ে এসে বসলাম বারান্দায়। এখান থেকে সল্ট পিটগুলো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। দলে দলে বাইসন এসে জমায়েত হয়েছে সেখানে। তার মাঝে মাঝে কয়েকটা সম্বর হরিণ। হঠাৎ হঠাৎ শোনা যাচ্ছে এক অদ্ভুত হাড় হিম করা চিৎকার - ওটা নাকী বারকিং ডীয়ার-এর ডাক। একটু বাদে সবাই নীচে নেমে এসে আবার নদীর ধারে বসলাম। দিনের ট্যুরিস্টরা ফিরে চলে গেছে জঙ্গলের সীমানার বাইরে। বাংলোর বাসিন্দা আমরা ক'জন আর বনবিভাগের কর্মচারীরা। চাঁদের আলোয় জঙ্গলের পরিবেশ অদ্ভুত মায়াবী লাগছে। বাংলোর কর্মচারীদের সাহায্যে একটা আলোর ব্যবস্থা করা হল। ওই আলো ফেলতেই দেখতে পেলাম বাইসন আর সম্বর হরিণের দল। হঠাৎ চোখে পড়ল একটা বেশ বড় বাইসন নদী পেরিয়ে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। দূরত্ব তখনও প্রায় ২০-৩০ ফিট হবে। এমন সময়েই বাংলো থেকে জানাল রাতের খাবার রেডি।

খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, হঠাৎ কেউ একজন হাঁক দিলেন, সবাই আসুন - দুটো দাঁতাল এসেছে। আমরা দৌড়ে গিয়ে দেখি মূর্তিমান দুই দাঁতাল আর তাদের একটা বাচ্চা। বড় হাতিদুটোর দাঁত আর হাবভাব দেখে বোঝাই যাচ্ছিল যদি ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে তাহলে কী হতে পারে। সল্ট পিট এখন হাতিদের দখলে। ওদের আর আমাদের মধ্যে ব্যবধান শুধু একচিলতে হলং নদী। আকাশে পূর্ণচন্দ্র আর জঙ্গলের আদিম পরিবেশ। একটু বাদে দাঁতালগুলো ফিরে গেলে আবার বাইসন আর সম্বরেরা সল্ট পিটের দায়িত্ব নিল। আমরা ঘরে ফিরলেও চোখে ঘুম এলনা। বারান্দায় বসে রইলুম জঙ্গল উপভোগ করতে - আশা যদি গণ্ডার আসে।

আকাশে তখন হাল্কা আলোর আভা। সবে ভোর হয়-হয়। বাইসন আর দু' একটা হরিণ তখনও ছিল। আরও একটু সকালের আলো ফুটলে ওরা ফিরে গেল জঙ্গলের গহীনে। নানা রকম নাম-নাজানা পাখির কলতান শোনা যাচ্ছে। এবার হাতির পিঠে চড়ে জঙ্গলের ভেতরে যাওয়ার প্রস্তুতি। দুটো বড় হাতি - এদের পিঠেই আমরা উঠব। তাদের সঙ্গে একটা বাচ্চাও রয়েছে। বাচ্চাটা দেখতে বেশ সুন্দর। মা-বাবার সঙ্গে টুকটুক করে যেন প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছে। আমাদের যাত্রা শুরু হল। হাতিদের যাওয়ার নির্দিষ্ট কোন পথ নেই। জঙ্গলের বড় বড় গাছের মধ্যে দিয়েই এগিয়ে চলল। শুঁড়ে করে বড় গাছ সরিয়ে বা খেয়ে তাদের পথ করে নেওয়া। তারা আবার একসঙ্গে ছাড়া এগোবে না। জল পেরিয়ে কাদা পেরিয়ে হাজির হল এক সবুজ তৃণভূমিতে। এটা গণ্ডার থাকার উপযুক্ত স্থান। হঠাৎ মাহুতের ডাকে তাকিয়ে দেখি জলে পুরো গা ডুবিয়ে আরাম করছে একটা গণ্ডার । জলদাপাড়ায় অনেক গণ্ডার থাকলেও তাদের দেখা পাওয়া মুস্কিল। গণ্ডার দেখে ফেরার পথে এবার ছবি তোলার পালা। কিন্তু হাতিদের ছবি তোলা ভয়ঙ্কর না-পসন্দ। তারা এক হাড়কাঁপানো ডাক ছাড়ল যাকে বলে বৃংহণ। ফেরার পথে চোখে পড়ল এক অতি ভীতু হরিণ আর গাছের মগডালে ময়ূর। একটা অদ্ভুত সুন্দর নীল নকশাওলা পাখি বারবার ক্যামেরার লেন্সকে ফাঁকি দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। হয়ত সব সৌন্দর্যকে ফ্রেমে বন্দী করা যায় না। কিছু জিনিস মনের ক্যামেরাতেই রেখে দিতে হয়। হাতির পিঠ থেকে নেমে দেখি সেই বাচ্চা হাতিটাকে সবাই আদর করছে। তাকে ঘিরেই চলছে ফটো শ্যুট।

প্রাতরাশ সেরে আবার নদীর ধারে বসলাম। অন্য পর্যটকদের নিয়ে তখন দুলকি চালে হাতির দল চলেছে। হস্তীশাবক খেলাচ্ছলে নদী পেরোচ্ছে। একটু বাদে দেখি অনেক সবুজ পায়রা (গ্রীন পিজিয়ন) এসে হাজির ওই সল্ট পিটের কাছে। প্রকৃতির বুকে কী সুন্দর খেলা করছে। নীল পাখি আর সাদা পাখির ওড়াউড়ির ফাঁকেই হঠাৎ হাজির কালকের ময়ুরগুলোও। এবার যেন আরও কাছে। তাদের পেখমে নীল সবুজের অসাধারণ মেলবন্ধন। দেখতে দেখতে কখন আকাশে হঠাৎ মেঘের ঘনঘটা। দু চার ফোঁটা পড়তেই ক্যামেরা বাঁচাতে ঘরে ফিরে এলাম।

দুপুরের খাওয়া সেরে খয়েরবাড়ি লেপার্ড সেন্টার। সেখানে কিছু বন্দী লেপার্ড দেখা হল কিন্তু বন্য পরিবেশে লেপার্ড আর এবারে দেখা হল না। ডুয়ার্স দেখার জন্য এটা খুবই কম সময়। তবুও হলং বাংলোর ওই রাত, মন কেমন করা এমন একটা সকাল আর হাতির বৃংহণ হয়ত আমার বাকী বছরের অক্সিজেন।

গাড়ি এগিয়ে চলল গরুমারা আর মূর্তি নদীর পাশ দিয়ে নিউ জলপাইগুড়ির দিকে। বিদায়বেলায় সূর্য তখন পশ্চিমাকাশে রক্তিম আভা ছড়িয়ে দিচ্ছে...

~ জলদাপাড়ার তথ্য ~ জলদাপাড়ার আরও ছবি ~

শিবপুর বি ই কলেজ থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে বর্তমানে বাঙ্গালোরে কর্মরত জয়ন্ত লাহা ভালোবাসেন বেড়াতে, ছবি তুলতে আর সেই বেড়ানোর আনন্দ সবার সঙ্গে ভাগ করে নিতে।

কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00
Like Be the first of your friends to like this.
tell a Friend